# নারায়ণ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ হইতে কার্ত্তিক, ১৩২৩।

দ্বিতীয় বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ডের

## সূচীপত্র।

( বিষয়ভেদে বর্ণানুক্রমিক। )

# সূচীপত্র।

## লেখক ও লেখিকাগণের বর্ণানুক্রমিক নাম।

| লেখক বা লেখিকা | | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|

# নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা ] [ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সাল

## আর্টের আধ্যাত্মিকতা

কলাবিদ্যার সহিত ধর্ম্মজীবনের কোন স্বাভাবিক বিরোধ আছে কি ? পিউরিটানগণ (Puritan) কাব্যসঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহুদির ধর্ম্মশাস্ত্রে (Talmud) মানুষ হউক দেবতা হউক কাহারও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা একেবারে নিষেধ। প্লেতো তাঁহার আদর্শ মনুষ্যসমাজে (Republic) কবিকে আসন দিতে চাহেন নাই। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মবোধের সহায়, ধর্ম্মজীবনের উদ্দীপক। ইহসর্ব্বস্ব যে চারুকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তিসকলের মূর্ত্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর মহত্তর শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র !

অধ্যাত্ম বিদ্যাই পরাবিদ্যা, আর সব অপরাবিদ্যা। ধর্ম্মজীবনই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র স্পৃহনীয় বস্তু। ইহাই যদি সত্য, তবে যে বস্তু ধর্ম্মের সহায় মানুষ শুধু তাহাই চাহিবে—ধর্ম্মের যাহা পরিপন্থী তাহা হইতে মানুষ দূরে থাকিবে। সকল অপরাবিদ্যা

সেই এক পরাবিদ্যারই সোপানস্বরূপ সৃজন করিতে হইবে। জগতের যদি কিছু মহিমা বা সৌন্দর্য্য থাকে তাহা ভগবানে, তাই অপরাবিদ্যার সার্থকতা একমাত্র পরাবিদ্যার অনুচর হইয়া। এই সূত্রটি আমরা আজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এই সূত্রটি কতদূর সত্য, ইহার প্রকৃত অর্থই বা কি?

প্রথমেই আমরা বলিতে চাই চারুকলা বা আর্টের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি। ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, রমণী-সম্ভোগে আর এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণ সৃষ্টি করিতে পারেন। রমণী-সম্ভোগের চিত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুধু রসসৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্যবাধকতা আছে কি? প্রতিপক্ষ উত্তরে বলিবেন ভগবানই একমাত্র পূর্ণরসের আধার। সাধারণ জাগতিক জীবনে রসের বা সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু সে রস সে সৌন্দর্য্য ভগবানেরই অংশ বা ছায়া, বেশীর ভাগই তাহা বিকৃত অংশ বিকৃত-ছায়া মাত্র। রমণী-সম্ভোগের কাহিনী অতি মনোমুগ্ধকর হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে যদি এমন কিছু না পাই যাহা ভগবানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে, তাঁহারই রসমূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলে, তবে রসসৃষ্টির দিক দিয়াও উহার পূর্ণ সার্থকতা নাই। যেমন তেমন ভাবে রসসৃষ্টি করিলেই যদি আর্ট হয়, তবে শিল্পী যে-কোন বিষয় লইয়া যে-কোন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাহেন, তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরখণ্ডে ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সমস্যা হইতেছে ভগবান কি, ভগবানের রসমূর্ত্তিই বা কি? ভগবান বলিলে একটা নির্দ্দিষ্ট অবিকল্প বস্তুবিশেষ বুঝায় না। ভগবানের বহুমূর্ত্তি—কে যে কতভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমেই তাই আমাদের সন্দেহ আসিতে পারে, সাধুর ভগবান ও

শিল্পীর ভগবান কি একই, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? সাধু যে চক্ষে ভগবানকে দেখেন, শিল্পী ভগবানকে সেই চক্ষে নাও দেখিতে পারেন। সাধু ভগবানের যে রসমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, শিল্পী ঠিক তদ্রূপ পূর্ণভাবেই অন্য এক রসমূর্ত্তির পরিচয় পাইতে পারেন।

বস্তুতঃ সাধু বা ধার্ম্মিক দেখেন সেই ভগবান যিনি শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ—ইহলোকের প্রেরণাদি যাঁহাকে কলঙ্কলিপ্ত করে না। মানুষে যে মলিনতা, যে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ, যে স্থূলত্ব দেখিতে পাই, সে সকলের নিতান্ত অভাব যেখানে, শুধু সেইখানেই সাধুর ভগবান প্রকট। জগতের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক লীলার পশ্চাতে, জগতের সকল পাপ হইতে মুক্ত মঙ্গলময় এই ভগবানকেই যে শিল্পী লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই শিল্পীই তাঁহার কাছে প্রকৃত শিল্পী। সাধুর কাছে সেই শিল্পীরই আদর মানুষকে যিনি দুঃখদৈন্য ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অতীত করিয়া এক মহত্ত্বের আভায় রচিত করিয়াছেন। সাধুর কাছে ভগবান সদাচারী মুক্তপুরুষ হইলেও হইতে পারেন; শিল্পী কিন্তু তাঁহাকে শরীর মন প্রাণের দাস বলিয়াও জানে। ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে সাধুর আনন্দ—শরীরের ভোগের মধ্যে, এমন কি যাহাকে আমরা অশুদ্ধভোগ বলি তাহার মধ্যেও যে আনন্দ রহি-য়াছে, সে আনন্দ যে ভগবানেরই আনন্দ, তাহা যে হীনতর নয়, ইহা শিল্পীই দেখাইতে পারেন; এইখানেই শিল্পীর শিল্প। শান্ত শুদ্ধ আনন্দে সাধু যদি ডুবিয়া থাকেন, মরজীবনের উদ্বেলিত স্রোতের মধ্যেই শিল্পী যে অমৃতরস পাইয়াছেন তাহা যদি তিনি উপভোগ না করিতে পারেন, তবে ভগবানকে তিনি খণ্ডীকৃত করিয়াই দেখেন নাই? মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু দুইটিকেই সমানভাবে সত্যরসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন।

সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু এবং সংস্কারক জগৎকে মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সতীধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরূপ এক একটি আদর্শ। সাধু চাহেন জগতে সকল স্ত্রীই চিরকাল সতী হইবে, সকল মানুষই সত্যবাদী হইবে। অসতী স্ত্রীর চিত্র, মিথ্যাচারী মানুষের চিত্র তাই তিনি দেখিতে ও দেখাইতে চাহেন না। কারণ উহা মিথ্যাচারকে, অসতীত্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে; চাহি না যাহা তাহা বাস্তব জীবনেও যেমন চাহি না, সেইরূপ শিল্পকলাতেও তাহাকে চাহি না, কোনক্ষেত্রে কোথাও তাহাকে চাহি না। শিল্পী কিন্তু বলেন, না চাহিতে পারি বটে, কিন্তু যাহা পাইতে চাহি না, হইতে চাহি না তাহার মধ্যেও ভগবানের, অনন্তের অনন্তমূর্ত্তির এক মূর্ত্তি, তাহার মধ্যেও সত্যবস্তু রহিয়াছে, তাহারও "কেন" "কি" আছে, আমি তাহা বুঝিব, লোকচক্ষে ধরিয়া দেখাইব। পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইব কেন? বাস্তব জীবনে না হয় পুণ্যবানই হইলাম, জগতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু পুণ্যবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা কি উদ্দেশ্য কি তত্ত্ব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? বৃদ্ধ হইতে কেহ চাহে না। চিরযৌবন পাওয়াই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেবগণ চিরযুবা। কিন্তু সেই জন্য বলিতে হইবে কি বৃদ্ধত্বে কোন সত্য নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই? না, বৃদ্ধকে শুধু এই ভাবেই আঁকিতে হইবে যাহাতে লোকের মনে বৃদ্ধত্বের উপর একটা ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে বৃদ্ধত্বকে ছাড়িয়া লোকে যৌবনের উপরই অধিকতর আকৃষ্ট হয়?

জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিয়োজিত করেন না, সে আদর্শ যতই মহান হউক না কেন। আদর্শ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। কোন আদর্শ কোন যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে সেই অনুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা প্রচালিত

করেন না। আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য, উদাসীনভাবে ধ্যান করেন পাপপুণ্যে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, অন্তের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা। তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করান। জগতের কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শিল্পীর শিল্প পরম সাহায্যকারী হইতে পারে, কারণ তিনি সেই উদ্দেশ্যটির সত্য সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে সক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু এই কর্ম্মেই যদি শিল্পী আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের রহস্য অনেকখানি আবরিত রহিয়া যাইবে, ভগবানের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে যে কত রস উৎসারিত হইতেছে তাহার কোনই আস্বাদ পাইব না।

আর্টের বিচারকালে এই অনন্তরসবোধের কথা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। তৎপরিবর্ত্তে সাধুর ন্যায় ভগবানের এক বিশেষরূপ কল্পনা করিয়া, কখন বা ধার্ম্মিকের ন্যায় নৈতিক কল্যাণের মানদণ্ডদ্বারা আমরা আর্টের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই। সামাজিক বা রাজনীতিক মঙ্গলসাধনেও আর্টকে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করি। মনুষ্যজাতির উন্নতির দিক দিয়া, ব্যবহারিক হিসাবে, দেশকালপাত্র হিসাবে ভগবানের এক বিশেষ মূর্ত্তির আরাধনা প্রয়োজন হইতে পারে। সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক কল্যাণসাধনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এসকল কিছু আর্টের অন্তরঙ্গ কথা নয়।

আমরা বলিয়াছি আর্টের মূল কথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্ব্বত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা সুন্দর বা অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে যাহা ভাল বা মন্দ, সেই সকলের মধ্যেই একটা নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। বস্তুর যে গুণ, যে নিজস্বতা, যে বৈশিষ্ট্য, জগতের রঙ্গমঞ্চে তাহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর সত্য। এই সত্যটিই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ—এই জিনিষটিকেই শিল্পী দেখাইতে চাহেন। জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, ধার্ম্মিক সংস্কারক বা সাধুর

কাছে সে সমস্তই মঙ্গলকর প্রিয় বা সুবিধাজনক না হইতে পারে। কিন্তু কিছুই নিতান্ত অসত্য নয়। একটা কিছু সত্যপ্রাণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক বস্তু প্রকাশিত হইতেছে। এই সত্যটিই তাহার আনন্দ ঘন-স্বরূপ, ইহাই তাহার সৌন্দর্য্য, ইহাই তাহার মধ্যে ভগবান। শিল্পীর লক্ষ্য এই ভগবান। সাধুর বিরাট বৈরাগ্য ফুটাইয়া তুলিতে শিল্পীর যেমন কৃতিত্ব, কর্ম্মীর কর্ম্মপিপাসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহার ঠিক সেই একই কৃতিত্ব। কামীর কামোন্মত্ততা দেখাইয়াও তাঁহার মর্য্যাদার কোন হানি নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মের সহিত আর্টের কোনই বিরোধ নাই। বরং অধ্যাত্মই আর্টের জীবন, তাহার প্রথম ও শেষ কথা। অধ্যাত্ম অর্থ আত্মা-সম্বন্ধীয়। যোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার ভোগে। যোগীর যোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসাবে শিল্পীই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী। করুণাবতার ভগবান তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্মা নাদির সাহের প্রতিমূর্ত্তিকে শিল্পজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে কেন? কালিদাস আদিরসের অধ্যাত্মচিত্র দিয়াছেন। এই চিত্র যদি পাঠকের মনে আদিরসের ভাব জাগাইয়া তুলে তাহাতে কালিদাসের দোষ কি? কালিদাসের উদ্দেশ্যই ত এই ভাবটিকে গোচর করিয়া ধরা। মানুষের পক্ষে কোন অবস্থায় এই ভাবটি ধর্ম্মসাধনের বাধাস্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু সেই জন্য উহা যে মূলতঃ অসত্য বা অসুন্দর তাহা কে বলিবে?

নগ্ননারীর চিত্র আমাদের চক্ষুকে যে পীড়িত করে তাহা শুধু আমাদের নীতিবোধের জন্য নহে, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের জন্যও বটে। কারণ সচরাচর যে চিত্র দেখি, তাহা চিত্র নয়, ফটোগ্রাফ মাত্র, প্রকৃতির হুবহু নকল। অসুন্দর কাহাকে বলি? অসুন্দর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটি শুধু দেখায়, বস্তুর অন্তরের

রহস্যটি যাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুৎসীত, তাহা নগ্ননারীরই হউক আর সাধুপুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নগ্ননারীই দেখি, নগ্ননারীত্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জটাবল্কল দেখি কিন্তু সাধুত্বের ব্যাখ্যা পাই না। আর্টের দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন কুৎসীত, রবিবর্ম্মার দেবদেবীর মূর্ত্তিও ঠিক তেমনি কুৎসীত। শুধু শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোন সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাধুর অতীন্দ্রিয়পরতা, নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও যেমন তাহা হেয়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলঙ্গ রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে লম্পটের দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া, তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভাগবত এক সত্য। অপরে মনের খেলার দাস হইয়া বলিতেছে, ইহা শুদ্ধ, উহা অশুদ্ধ, ইহা পুণ্য, উহা পাপ। কিন্তু ঋষিকল্প শিল্পী দেখিতেছেন, সত্য কি? বস্তুর নিগূঢ় তথ্য কি? কোথায় রসের সহস্রধারা উৎস?

কবি যিনি দ্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টি করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। সিদ্ধের পূর্ণ সত্যানুভূতি অপরিণত সাধকের পক্ষে তাহার সাধনের দিক দিয়া দেখিলে সকল সময়ে স্পৃহনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবুও সিদ্ধেরই অনুভূতি প্রকৃত সত্য। সাধকের জন্য যে সত্য তাহা ক্ষণিক, সাময়িক, তাহার মূল্য সার্ব্বজনীন অথবা চিরন্তন নহে। কবির কথা সিদ্ধপুরুষের কথা। সাধন অবস্থার কোন মানদণ্ড লইয়া সে কথা বিচার করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এসব কথা যে সাধকের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে, সাধককে এ সকল বিষয় হইতে যে দূরে দূরে রাখিতে হইবে তাহারও আবশ্যকতা কিছু নাই। উলঙ্গ নারীর চিত্র

আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেই জন্য উহাতে যে সত্য যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন? ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিতে যাইয়া ইন্দ্রিয়ের সত্য-ভোগকে নির্ব্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্যবিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।

কিন্তু সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্ম্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ 'ইহা নয়' 'ইহা নয়'; শিল্পীর পথ 'ইহাই, 'ইহাই'। সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্য দিয়া সাধু ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন। শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রদ্ধাটুকু সর্ব্বদার জন্য ধরিয়া রাখিলে জীবনেও তিনি মুক্তসিদ্ধ হইতে পারেন। সাধু তাঁহার সাধুত্বের, ধার্ম্মিক তাহার ধর্ম্মশীলতার পরিমাপ করেন কোন্ বিষয়ে কোন্ বস্তুতে তাঁহার মতি বা অমতি, সেই বিষয় সেই বস্তুর রূপ বিচার করিয়া দেখিয়া। শিল্পী কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনে মনোযোগ দেন না। তিনি জানেন বিষয়ে কিছু দোষ নাই। তিনি দেখেন শুধু তাঁহার অন্তর, তাঁহার সহজ সত্য প্রেরণা ও সেই অনুসারে যে বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই সত্যসুন্দর মঙ্গলকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। আচরণ, উদাহরণ, শিক্ষা, ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু ধর্ম্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যাডো-নার ( Madonna ) ছবিই তুমি অঙ্কিত কর, আর বারনারীর ছবিই অঙ্কিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতিগত দোষ নাই। প্রশ্ন শুধু, সত্যভাবটিকে পাইয়াছ কি?

আর্টের প্রভাব প্রসার সূক্ষ্ম। স্থূলপ্রকৃতি আমরা তাহা সহজে অনুভব করি না। আমরা চাই স্থূলপ্রভাব—স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া না দিলে আমরা বুঝি না, লাঠ্যৌষধি না হইলে আমাদের চৈতন্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের তাই সৃষ্টি হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চাহিতেছি। নীতির প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে, মানুষের স্থূলভাগটির পরিবর্ত্তনের সাহায্যের জন্য। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম যে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার অধ্যাত্মসত্ত্বা কোন দিনই নীতির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবে না। আর্ট হই-তেছে দৃষ্টি Revelation। এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎভাবেই আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। অনেক সময়ে অজানিত ভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হইয়া যাই। এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ। ইহাকেই ধর্ম্মসাধনের ভাষায় ভগবৎপ্রসাদ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই ভগবৎপ্রসাদ যিনি পাইয়াছেন, ব্যবহার-শাস্ত্রের এমন কি সাধনারই বা তাঁহার প্রয়োজন কি? এই ভগবৎপ্রসাদের ফলে শিল্পী সহজেই কৃচ্ছ্রসাধনা ব্যতিরেকে, ভোগের মধ্য দিয়া, ইন্দ্রিয়-লীলার সত্য-সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতেই নির্ম্মল শুদ্ধচিত্ত, আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই—ধর্ম্ম অর্থে নৈতিক আচার-বিচার বা সাধুজীবন না বুঝিয়া, বুঝি যদি সত্যধর্ম্ম, যাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিগোচর। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য, আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মদ্রষ্টা আত্মাকে দেখিতে যাইয়া যদি আবার শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাখেন, তবে শিল্পীও স্বচ্ছন্দে শরীরমধ্যে সকলরূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে শব্দে বাক্যে প্রস্তরফলকে মূর্ত্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কার্য্য করিবেন।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

## মধুর পন্থী

আমি যাব, যাব তাহারি সদনে।
যে পথে গিয়াছে শত মহাজন,
উপল বন্ধুর গিরি দরী বন
আমি যাব না সে ভীম শরণে
আমি যাব, যাব তাহারি সদনে।

যাব, কুসুমের মত ফুটিতে ফুটিতে
যাব সে যাবক চরণে লুটিতে
সুরভির মত যাব অলখিতে
মিশিয়া বাসন্তী পবনে,
যাব, যাব তাহারি সদনে।

আপনার পথ আপনি করিয়া
নিঝরের মত যাইব ছুটিয়া
তুলে কলতান সারাপথ গান
মুখরিত করি ভুবনে।
যাব, যাব তাহারি সদনে।

শুনিয়া সে গীতি গাহিবে পাপিয়া
প্রতিধ্বনি গাবে পিয়া পিয়া পিয়া,
চমকি ভুবন ছুটিবে মাতিয়া
সে সরল সুন্দর শরণে

যাব করে করে ধরি গাহি গুন্ গুন্
পদে বাজিবে মঞ্জীর রুণু ঝুনু রুণু
যাব সকলে মিলিয়া নাচিয়া গাহিয়া
যাব, যাব তাহারি সদনে ;

চির সুন্দর প্রাণেশ আমার
সুন্দর পথে যাব অভিসার
সুন্দর গীতি সুন্দর বাঁধা
লুকি সুন্দর লাজ নয়নে !
যাব, যাব তাহারি সদনে।

রুধি নিশ্বাস করি উপবাস
যায় কি পিয়ারী বন্ধুর পাশ
তার প্রেম যোগ তনুযা সম্ভোগ
ইঙ্গিতে বঁধু দেছে যে আভাস,
পাসরিব তাহা কেমনে।
যাব, যাব তাহারি সদনে।

এ তনুর প্রতি অণু পরমাণু
ভালবাসে পিয়া বাঁধা তাহে জনু
তারে কঙ্কালসার করিয়া তাহার
নিকটে ধরিব কেমনে
যাব, যাব তাহারি সদনে,

তাই, সজ্জা করিব লজ্জা ত্যজিয়া
ভাল করে বেণী বাঁধলো সখিয়া

হৃদয় উচ্ছ্বাস ফুটে বাহিরিয়া
ফুটে মদির মৃগ নয়নে।
যাব, যাব তাহারি সদনে।

দুলিবে গীতি, শ্রুতি কুণ্ডলে!
উঠিবে গীতি চেল অঞ্চলে
নাচিবে গীতি মঞ্জীর তালে
মৃদু মন্থর গমনে।—
ভেটিতে সুন্দর চল সুন্দরী
সুন্দর গীতি শরণে।

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

---

# রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মসভা

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মসভারই প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটা নূতন ধর্ম্মের কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ নামে একটা নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। একটা বিশেষ ধর্ম্ম বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার সঙ্গে জগতের অপরাপর ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের একটা বিরোধ বাধিয়া উঠিত। কারণ প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মসকল যতক্ষণ না অসত্য বা অক্ষম বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণ কেহ কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যায় না। প্রাচীনের অসত্যতা ও অপূর্ণতাকে দূর করিয়াই খৃষ্টীয়ান্ প্রভৃতি ধর্ম্মের

প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্ প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মসকল ভ্রান্তিপূর্ণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শনে অক্ষম বলিয়া ভাবিলেই রাজাও ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটা অভিনব সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রতী হইতে পারিতেন। আর সে অবস্থায় সত্যাসত্য প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য লইয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্মের সঙ্গে ঐসকল পুরাতন ও প্রচলিত ধর্ম্মের একটা নিত্য-বিরোধ জাগিয়া থাকিত। কিন্তু রাজা একেবারে কোন ধর্ম্মকেই অসত্য কহেন নাই। এমন কি, যে প্রচলিত প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি অমন খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে পর্য্যন্ত একান্ত অসত্য বা ধর্ম্মবিগর্হিত কহেন নাই। জগৎকার্য্য দেখিয়া জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যে ইন্দ্রিয়াতীত ও মনবুদ্ধির অগম্য পরমেশ্বর, তাঁহার চিন্তনে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদের নিমিত্ত এসকল কল্পিত রূপের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, অপরের জন্য নহে; এই শাস্ত্রপ্রমাণে রাজা বুদ্ধিমান শিক্ষাভিমানীদিগের পক্ষে এসকল বাহ্য-পূজা নিন্দনীয় ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় বলিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে যেমন এগুলিকে একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, রাজা কদাপি তাহা করেন নাই। প্রত্যুত এসকল প্রতিমার বা দেবদেবীর পূজা যাহারা করে, তাহারাও যে আপনাপন আরাধ্য দেবতাকে জগতের স্রস্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া মনে করে, রাজা বারম্বার একথাও স্বীকার করিয়াছেন। রাজা যেভাবে প্রত্যক্ষ জগতের বিচিত্র রচনার আলোচনা করিয়া এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার চিন্তন ও ধ্যানধারণার প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মসভার ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে এসকল বাহ্য ও কল্পিত পূজা-অর্চ্চনা—শুষ্ক পত্র যেমন আপনা হইতে বৃক্ষ-শাখা হইতে ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ উপাসকের মন ও ব্যবহার হইতে চলিয়া যাইবে, ইহা তিনি জানিতেন। যতদিন না এইরূপ সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে এসকল বাহ্য ও কল্পিত পূজা-অর্চ্চনা আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ততদিন এসকল হইতে লোককে প্রতি-

নিবৃত্ত করিতে তিনি চান নাই, বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার যত কিছু বিচার ও তর্কবিতর্ক কেবল বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, পাণ্ডিত্যাভিমানী লোকের সঙ্গেই হইয়াছিল। এসকল লোকের পক্ষে যে এই বাহ্য পূজা বিহিত হয় নাই, ইঁহারা শ্রেষ্ঠতর অধিকারী হইয়াও কেবল সাংসারিক স্বার্থ ও সুবিধার জন্যই নিজেরাও এসকল পূজা করিতেন ও সাধারণ লোককে এসকলে প্রবৃত্ত করাইতেন, রাজা এই কথা বলিয়াই ইহাদিগের কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; নতুবা সাধারণ খৃষ্টীয়ান্ বা মুসলমানদিগের মতন রাজা কখনও এসকল বাহ্য পূজা-অর্চ্চনাকে অধর্ম্ম বা দুর্নীতি বা পাপ, এমন কি একান্ত অসত্য বলিয়াও প্রচার করেন নাই। যাহারা যে কোনও কারণেই প্রতিমাদির পূজা করেন, তাঁহারা যে ব্রহ্মসভার উপাসনা করিবার অনধিকারী বা ব্রহ্মসভার সভ্য হইতে পারেন না, কিম্বা ব্রহ্মসভার আচার্য্যের বা অন্য কোনও কর্ম্মচারীর পদ পাইতে পারেন না, রাজা রামমোহন কখনও একথা বলেন নাই। এদেশের প্রতিমা-পূজকেরাও যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, যখন প্রতিমাদির প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকেও তাঁহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সাধন করিবার সময় কেবল জগতের স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তারূপে আপনাপন ইষ্টদেবতার চিন্তন ও ধ্যান করেন,—এবং প্রতিমাদিকে দেবতার আবির্ভাব-স্থান ভাবিয়াই এসকলের ভোগ-আরতি করেন, তখন ইঁহারাও ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠলোষ্ট্রের পূজা করেন না। আর এই জন্য ইঁহারাও ব্রহ্মসভায় যোগদান করিতে পারেন, রাজা ব্রহ্মসভায় যে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন, ইঁহারাও তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান্, মুসলমান্, বৌদ্ধ, জৈন, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোককেই রাজা তাঁর ব্রহ্মসভাতে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও সাধনাদি বর্জ্জন না করিয়াও ব্রহ্মসভাতে আসিতে পারেন, রাজা ইহাও বলিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতে

রাজা রামমোহন রায় যে কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন বা বিশিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চান নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। ব্রহ্মসভার ক্রমবিকাশে, পরে এরূপ সম্প্রদায়-গঠন অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল কি না, সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ব্রহ্মসমাজের পরবর্ত্তী ইতিহাসের আলোচনায় এ প্রশ্নের বিচার করাও আবশ্যক হইবে। কিন্তু সেই বিচারের দ্বারা রাজা রামমোহন যে কোনও নূতন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, একথা অপ্রমাণ হইবে না—হইতেই পারে না।

রাজা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রচার ও প্রবর্ত্তন না করিয়া থাকেন, তবে তিনি করিয়াছেন কি ? এই প্রশ্ন উঠে। তাহা হইলে তাঁর কার্য্যের বিশেষত্বটাই বা কি, প্রয়োজনই বা কি ছিল, এই বিচার করিতে হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় এই-মাত্র বলা যাইতে পারে যে জগতের সকল ধর্ম্ম বিবিধ নামরূপাদির সঙ্গে যুক্ত করিয়া যে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, রাজা এসকল নাম-রূপাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, সেই পরব্রহ্মের পূজাই প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই রাজার ব্রহ্মসভার বিশেষত্ব। এই ভাবে সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ও বিশিষ্ট নামরূপাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, কেবল জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা রূপে পরমেশ্বরের ভজনাতে সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকেই সমভাবে যোগদান করিতে পারেন। আর এইরূপে সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের একটা সাধারণ মিলনক্ষেত্র রচনাই ব্রহ্মসভার লক্ষ্য ছিল। এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠায় যাঁহাকে উপাস্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রদায়বিশেষের বা ধর্ম্মবিশেষের বিশিষ্ট উপাস্য নহেন, কিন্তু সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্য। জগতের যে যেখানে যেনামে, যেভাবে, যেউপায়ে বা উপকরণে, যাঁহারই উপাসনা করুক না কেন, রাজা বলিতেছেন, সে তাহার নিজের

এই উপাস্যকে এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা মনে করে। ইঁহাকেই ত বেদান্তে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার মধ্যে ও যাঁহার শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বিশ্বের প্রবাহ অবিরাম গতিতে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে ও অন্তিমে, প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে ও যাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। এইভাবেই বেদান্ত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের কারণ ও নির্ব্বাহককেই শাস্ত্রে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম কোনও প্রকারের নামরূপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তাঁর কেবল একনাম—তজ্জ ও তল্ল ; অর্থাৎ যাঁহা হইতে বিশ্বের জন্ম ও যাঁহাতে বিশ্বের লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। আর যে যাঁহারই উপাসনা করুন না কেন, তাঁহাকেই বিশ্বের জন্ম-স্থিতিলয়-হেতু বলিয়া মনে করে। অতএব জগতের একমাত্র উপাস্য ব্রহ্ম। "অনুষ্ঠান" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে "কে উপাস্য ?" এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা কহিয়াছেন :—

অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তিসম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ, ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীর যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

রাজা এই উপাস্যেরই উপাসনা প্রচার করেন। আর জগতের সকল ধর্ম্ম ও সকল উপাসকই যখন আপন আপন উপাস্যকে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারণ বলিয়া মনে করেন, তখন বিচারত কেহই এই উপাসনার বিরোধী হইতে পারেন না। রাজা বলিতেছেন :—

এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না ; কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক

উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাঁহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারে যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বুদ্ধ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না। এবং চীন ও ত্রিবৃৎ ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন উপাস্যকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক কহেন, সুতরাং তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনা রূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

বিচারত যদি অপর উপাসকেরা, রাজা যে উপাসনা প্রচার করেন, তাহার বিরোধী হইতে না পারেন, তাহা হইলে, রাজা বা রাজার অনুবর্ত্তীগণও অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী হইতে পারেন না। প্রশ্নকর্ত্তা এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া, "আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কি না?" এই প্রশ্ন করিলে, রাজা কহিতেছেন :—

কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপসনা করেন সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।

কিন্তু তাই যদি হয়, অর্থাৎ আপনারা যে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি? রাজা ইহার উত্তরে কহিতেছেন :—

তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয়বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা, যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, এক প্রকার

অবয়ববিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার, অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই।

যে যারই উপাসনা করে, সে তাহাকেই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং নানা নামে, নানাবিধ উপায়ে ও উপকরণসহায়ে জগতের সকল লোকেই যিনি জগতের কারণ ও কর্ত্তা, বিশ্বসংসার যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, তাঁহারই উপাসনা করে, এই সর্ব্ববাদীসম্মত প্রত্যক্ষ সত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাজা জগতের সকল ধর্ম্মের একটা সাধারণ মিলন-ভূমির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার এই ধর্ম্ম-সূত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। এই মূল বিষয়ে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে। এই ঐক্যের উপরেই রাজা তাঁর ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

ফলতঃ রাজার সমস্ত কর্ম্মেরই এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে তিনি সর্ব্বদা, সকল বিষয়েই একটা সঙ্গতি ও সমন্বয়ের পথ খুঁজিয়া চলিতেন, অথচ সকল বিষয়েই আবার তিনি সময়োপযোগী সংস্কার এবং পুনর্গঠনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সংস্কার করিতে যাইয়া প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে তাঁর চারিদিকেই গুরুতর বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই বিরোধের কোলাহল এবং বিক্ষেপের মধ্যেও রাজা কখনও মিলন ও সামঞ্জস্যের সূত্রটি হারাইয়া ফেলেন নাই। আর তাঁর প্রত্যক্ষবাদই তাঁহাকে এই মিলনসূত্রটি দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। রাজা দেখিলেন প্রত্যক্ষের ভূমিতে সত্যে সত্যে কোনও বিরোধ হয় না। এখানে অশেষ প্রকারের বিচিত্রতা আছে, কিন্তু কোথাও একটা কাল্পনিক ঐক্যের নামে অনর্থক ও সাংঘাতিক অনৈক্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। জগতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে যত বিবাদ বিসম্বাদ তাহা সকলই অপ্রত্যক্ষ, অতিপ্রাকৃত বিষয় লইয়া। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জগতের আস্তিক-নাস্তিক সকলেই স্বীকার করেন। জগৎটা যে কার্য্য, ইহা যে জন্যবস্তু, একথাও সকলেই মানেন। সুতরাং এই জগৎরূপ কার্য্যের একটা কারণও যে আছেই

আছে, ইহাও সকলেই বিশ্বাস করেন। এই পর্য্যন্ত আস্তিকে-নাস্তিকে, ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদীতে কোনও বিরোধ নাই। নিরীশ্বরবাদী-দিগকে রাজা কহিতেছেন—"তোমরাও ত কালকে বা স্বভাবকে অথবা পরমাণুকে কিম্বা অন্য কোনও পদার্থকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক বলিয়া স্বীকার কর। তোমরা যাঁহাকে কাল বা স্বভাব বা পরমাণু বা অন্য কিছু নামে অভিহিত করিতেছ, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলি। সুতরাং মুলে তোমাতে আমাতে ত অমিল নাই। আর এই জগতের উৎপত্তি যাঁহা হইতেই হউক না কেন, এই জগৎকার্য্য দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। কি আশ্চর্য্য ইহার পরিপাটি। কি অদ্ভুত ইহার বিচিত্রতা। কি নিগূঢ় ইহার ঐক্যবন্ধন। কি শৃঙ্খলা, কি কৌশল, কি নিপুণতা, কি অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এসকল চিন্তা করিয়া যে কারণ হইতে এই বিচিত্র, অদ্ভুত, সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল, অনার্ব্বচনীয় শক্তিশালী ও মহিমাময় জগতের প্রকাশ বা সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার কথা ভাবিয়া সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল ভাবের অনুশীলনই ত উপাসনা। এই "অনুষ্ঠান"-পত্রেই রাজা "উপাসনা কাহাকে কহেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতে-ছেন যে—

"পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।"

এইরূপে রাজা কি উপাস্য-নির্ণয়ে, কি উপাসনার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে, ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে বা সাধনাঙ্গে, কোনও দিকেই কোনও প্রকারের অপ্রত্যক্ষ ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। এমন কি, পাছে তাঁর প্রচারিত উপাসনাতে কি জানি কোনও অপ্রত্যক্ষ, অতিপ্রাকৃত বা কল্পিত বিষয় প্রবেশ করে, এই ভয়ে তিনি বারম্বার কেবল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণেরই উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, স্বরূপলক্ষণের কথা বেশী কহেন নাই। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে

ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহার স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই ব্রহ্ম অজ্ঞেয় কিম্বা কেবল সত্তামাত্র-জ্ঞেয়; এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনেকটা আধুনিক ইউরোপীয় অজ্ঞেয়তাবাদেরই মতন—Unknown এবং Unknowable—হার্বার্ট্ স্পেন্সার যে অজ্ঞেয়তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনেকটা ইহারই অনুরূপ। রাজা যে পরব্রহ্মকে উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, "তিনি কি প্রকার?"—এই প্রশ্ন হইলে, উত্তরে কহিতেছেন :—

তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না। ...তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন। এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অনন্ত, ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকাতেও এই কথাই কহিয়াছেন।—"ইহার (অর্থাৎ বেদান্তগ্রন্থের) দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরার এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন।" পুনরায় কহিতেছেন যে, "যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনাকালে তাঁহাকে জগতের পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপ করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা যে সকল বস্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না; ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা যায়।"

কিন্তু তাই বলিয়া রাজা যে স্পেন্সারের মতন অজ্ঞেয়তাবাদী বা

agnostic ছিলেন, এমন মনে করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান ও স্বরূপ-উপাসনা সম্ভব, রাজা ইহা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অন্য বিষয়ে যেমন, এখানেও সেইরূপ অধিকারী-অনধিকারী বিচার আছে। সকলের পক্ষে এই স্বরূপজ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। আপামর সাধারণের পক্ষে ইহা একরূপ অসাধ্য। কারণ শ্রুতিই কহিতেছেন ( কঠ—৪র্থ—১ )—

> পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
> তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
> দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

রাজা এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়াছেন:—

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয়সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোকসকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেন না। কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্তে বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন।

অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়সকলের একান্ত নিরোধ না হইলে, জীবের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারলাভ হয় না। যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের এরূপ একান্ত নিরোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি কহিয়াছেন। রাজা সমাধিতে বিশ্বাস করিতেন। সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রাজা স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন যে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা ব্রহ্মের যে নির্দ্দেশ করা হয় "সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।" এইরূপে তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম-নির্ণয় করিয়া তাঁহার চিন্তা ও অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে তাঁর স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধ হইয়া থাকে। সে স্বরূপ-জ্ঞানে ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানং অনন্ত-রূপে প্রতীত হয়। বেদান্তসূত্রের অনুবাদে রাজা কহিয়াছেন:—

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য-রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার কাহাকে বলে, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া কহিয়াছেন :—

বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয় আর যখন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রের স্ফূর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্মসাক্ষাৎকার কহি।

এই স্বরূপ-জ্ঞান কেবল সমাধিতে লাভ করা যায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইলে, সাধক প্রথমে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক রূপে ব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। বহুতর লোকের পক্ষে ইহাই কেবল সম্ভব। তবে "সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" কিন্তু এই সমাধির শক্তিলাভ অতিশয় কঠিন-সাধন-সাপেক্ষ বলিয়া অতি অল্প লোকেই এই স্বরূপ-উপাসনার অধিকার লাভ করেন। অধিকাংশ লোকে কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তারূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে এই উপাসনাই প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত ও সাক্ষাৎ অনুভূতি প্রতিষ্ঠ হইয়া সত্য হয়। যাঁহারা সমাধির শক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে স্বরূপ-উপাসনার প্রয়াস নিশ্চয়ই বস্তুজ্ঞানহীন অলীক মানসকল্পনাতে পরিণত হইবে। তাহারা মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিলেও বাঙ্ময়ী কল্পনার সৃষ্টি করিয়া অসত্যের উপাসনা করিবেই করিবে। এই জন্য রাজা সাধারণ লোকের নিমিত্ত তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিয়া, জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তারূপে তাঁহার চিন্তা করিবারই বিধান দিয়াছেন।

আর এই উপাসনা সকলের পক্ষেই উপযোগী। যে যে ধর্ম্মমত পোষণ করুক না কেন, আপনার উপাস্যকে স্রষ্টা পাতা ও সংসারের

প্রভু ও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং জগতের যিনি আদি কারণ তাঁহাকে কেবল স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তারূপে ধ্যান করিলে সকলেরই নিজ নিজ উপাস্যের ভজনা হয়, অথচ এখানে কাহারও সঙ্গে কাহারও কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইটিই সার্ব্বজনীন ঈশ্বরতত্ব ও এই ঈশ্বরতত্বের এরূপ ভজনাই সার্ব্বজনীন ভজনা। এই সার্ব্বজনীন ঈশ্বরতত্বের আশ্রয়ে, এই সার্ব্বজনীন ভজনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহাতে সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকে এক উদার ও বিশাল মিলনভূমিতে একত্রিত হইয়া, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানাদিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এক পরমেশ্বরের ভজনা করিতে পারেন, তাহারই জন্য রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ব্রহ্মসভা কোনও নূতন ও বিশিষ্ট ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করে নাই। ইহা হিন্দুর দেউল, খৃষ্টীয়ানের গির্জ্জা, মুসলমানের মসজিদ, বা বৌদ্ধ ও পারসী, শিণ্টো, ও কনফুচীয় প্রভৃতি ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের ভজনালয়কে ভাঙ্গিয়া, তাহাদের স্থান অধিকার করিতে চাহে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবে যে যেখানে, যেভাবে, যেনামে, যেউপকরণেই আপন আপন উপাস্যের পূজা করুক না কেন, সকলে যাহাতে ধর্ম্মের সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক লক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া, একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, সাধারণ ও সার্ব্বজনীনভাবে জগতের যিনি একমাত্র কারণ ও নিয়ন্তা, তাঁহার ভজনা করিতে পারে, ব্রহ্মসভা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন। ব্রহ্মসভার আকারে রাজা একটি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মক্ষেত্র ও ভজনের স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইহাই যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের পরিপূর্ণ আদর্শ বা চরম লক্ষ্য এমন নহে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাকে বাদ দিলে ধর্ম্মের যে সাধারণ তত্ব বা লক্ষণটুকু বাকি থাকে, তাহা অতি সামান্য। তাহার দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের

লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা least common multiple মাত্র প্রাপ্ত হই, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক বা greatest common measure প্রাপ্ত হইতে পারি না। ইহার মধ্যে ধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিকতা প্রাপ্ত হই তাহাতে ধর্ম্মবস্তুর লঘুতম লক্ষণ ও ক্ষুদ্রতম আকার মাত্র প্রত্যক্ষ করি, তাহার শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ বা বিকাশ যে কি, তার সন্ধান পাই না। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্তু তার কতটুকুই বা প্রত্যক্ষ হয়। মানবশিশুতে যতটুকু মনুষ্যধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তাহাকে ধরিয়া মনুষ্যত্ব বস্তুর স্বরূপ আমরা কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। প্রকৃত মনুষ্যত্ববস্তু কি ইহা দেখিতে হইলে শ্রেষ্ঠতম মানুষকে দেখিতে হয়। শিশুতে মনুষ্যত্ব অতি অস্ফুট বীজাকারে বা অঙ্কুরাকারে মাত্র প্রত্যক্ষ হয়। এই বীজ যেমানুষে পরিপূর্ণরূপে ফুটিয়াছে, তাহাতেই কেবল মনুষ্যত্বের পূর্ণ লক্ষণ ধরিতে পারি। সার্ব্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্তু তার সত্য স্বরূপ পরিপূর্ণ মানুষেই প্রকট হয়, শিশুতে হয় না। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসম্বন্ধেও ইহাই সত্য। রাজা যে সূত্র ধরিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর মাত্র প্রত্যক্ষ হয়, পরিপূর্ণ প্রস্ফুট ধর্ম্মবস্তুকে পাওয়া যায় না। রাজার এই সূত্র অবলম্বনে আদিম অবস্থার প্রেত-পূজা, নিসর্গ-পূজা, পশুপক্ষী গিরিনদী প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সকল অবস্থার, সকল প্রকাশের মধ্যে যে অতি সামান্য ঐক্যটুকু আছে তাহাই কেবল ধরিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্মবস্তু যে অপূর্ব্ব উন্নতি ও বিকাশ-লাভ করিয়াছে, তার সন্ধান খুঁজিয়া পাই না। অথচ ধর্ম্মের এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রকাশ বাদ দিলে তার পরিপূর্ণ সত্য ও মাহাত্ম্য কিছুই রক্ষা পায় না।

রাজা যে এসকল কথা ভাবেন নাই বা বুঝেন নাই, এমন

কল্পনাও করা সম্ভব নয়। বেদান্তে যেসকল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও পরোক্ষভাবে "কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার চিন্তন"-রূপ যে উপাসনা উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠায় রাজা তাহাই কেবল অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু স্বরূপোপাসনা যে সম্ভব ইহাও তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তবে কেবল শ্রেষ্ঠতম অধিকারী, যাঁহারা সমাধির শক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই স্বরূপ-উপাসনা করিতে পারেন, অপরের পক্ষে ইহা অসাধ্য বলিয়া অবিহিত। সুতরাং রাজা যে তত্ত্ব ও উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা যে ধর্ম্মের শেষ কথা বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা নহে, ইহা তিনি বেশ জানিতেন। আজিকালিকার ধর্ম্মবিজ্ঞান যেরূপে যতটা পরিষ্কার ভাবে ধর্ম্মের বিকাশ-ক্রমটির সন্ধান পাইয়াছে, ডারুইন-প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের মূল তত্ত্বের আশ্রয়ে ধর্ম্মের যে ঐতিহাসিক ধারার কথা আধুনিক পণ্ডিতেরা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই সকল অভিনব আবিষ্কার ও চিন্তার ফলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে তত্ত্ব আজিকালি প্রকাশিত হইতেছে, রাজার সময়ে তাহা হয় নাই। কিন্তু তথাপি রাজা আপনার অনন্যসাধারণ মনীষাপ্রভাবে, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈদান্তিক সাধনের অনুশীলনের দ্বারাই ধর্ম্মেরও যে ক্রমোন্নতি হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিয়াছিলেন। বেদান্তে একদিকে "ক্রম-মুক্তির" ও অন্যদিকে "পরম্পরা-উপাসনার" কথা কহিয়াছেন। রাজা এই "পরম্পরা-উপাসনার" সূত্রটি অবলম্বন করিয়াই তাঁর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও উপাসনাতত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া, এই "অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্বের" আশ্রয়ে অচিন্ত্যশক্তিশালী ও অনির্ব্বচনীয় গুণসম্পন্ন, অবাঙ্‌মনসোগোচর পরমেশ্বরের চিন্তার দ্বারা উপাসনা প্রচার করিয়া, রাজা জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের একটি সাধারণ মিলনসূত্র মাত্র দেখাইয়া দেন। কিন্তু এইখানেই ধর্ম্মসাধনের শেষ হইল, এমন কথা তিনি বলেন নাই, ভাবেন নাই,

কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তিনি সাধারণভাবে এই উপাসনাতে অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে মিলিত হইয়াও, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকে তাঁহার নিজের শাস্ত্র ও সাধন অনুযায়ী আপন আপন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি স্বদেশবাসী হিন্দুসাধারণকে বেদান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ বিদেশীয় খৃষ্টীয়ান্ সাধারণকে বাইবেলসম্মত ঈশ্বরোপাসনাতেই প্রেরিত করেন। তিনি খৃষ্টীয়ান্‌কে বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, কিম্বা হিন্দুকে খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহেন নাই। কেবল কি হিন্দু, কি খৃষ্টীয়ান্ সকলকেই নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে আপন আপন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-সাধনকে গড়িয়া তুলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মেতে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে সত্য আছে; সাধকগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতির আশ্রয়েই এসকল বৈশিষ্ট্যেরও প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু এসকল গভীরতর ও গভীরতম সত্যের সাক্ষাৎকারলাভ জন-সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। এ সকল অনুভূতিলাভ বহু-সাধন-সাপেক্ষ। জনসাধারণের সে সাধন নাই। সুতরাং তাহাদের পক্ষে এসকল গভীরতম তত্ত্ব অজ্ঞেয় ও অবোধ্য। যাহার অনুভূতি হয় নাই, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচারের যথাযোগ্য অবসরও মিলেনা। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় লইলে মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠতম অধি-কারীর সাধকেরা যে সকল নিগূঢ়তম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-ছিলেন, এবং শাস্ত্রাদিতে যে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ নিম্নতম অধিকারীর সাধকেরা সেই সকল অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বের অনুমান করিতে যাইয়া সকল ধর্ম্মেই অশেষ প্রকারের অলীক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। একের প্রত্যক্ষ অপরের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সর্ব্বদাই মিলে, মিলিবে। ইহা যেমন সত্য ও অনিবার্য্য; সেইরূপ

কল্পনায় কল্পনায় অমিল হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। তবে পুরাগত সংস্কার-বদ্ধ হইয়া যেসকল কল্পনা পুরুষানুক্রমে কোনও জাতির অস্থি-মজ্জাগত হইয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ অমিল হয় না ও হইবার আশঙ্কা অল্প। কিন্তু এখানে ব্যষ্টিভাবে একজাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একে অন্যের কল্পনার মধ্যে মিল দেখিতে পাওয়া গেলেও, সমষ্টিভাবে, অপর জাতির কল্পনার সঙ্গে সেরূপ মিল হয় না, হওয়াও অসম্ভব। আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষ মানসিক অবস্থাধীনে কালীদুর্গা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইউরোপের কোনও খৃষ্টীয়ান্ কখনও অনুরূপ মানসিক অবস্থাধীনে, অর্থাৎ ধ্যানের বা সমাধির অবস্থায়, কালীদুর্গা কিম্বা রাধাকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন না; তাঁহারা যীশুকে কিম্বা এঞ্জেল-দিগকে দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ মুসলমানেরা ঐ অবস্থায় হজ্‌রত্ মহম্মদকে কিম্বা আলীকে কিম্বা কোনও পীরকে দেখিয়া থাকেন। কোনও ইউরোপীয় খৃষ্টীযান্ যদি রাধাকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন, কিম্বা কোনও হিন্দু যদি যীশুখৃষ্টকে দেখিতে পাইতেন, অথবা আরবদেশের কোনও কোনও মুসলমান যদি শিবদুর্গার প্রত্যক্ষলাভ করিতেন, তাহা হইলে এসকল অনুভূতিকে সত্য অর্থাৎ বস্তুতন্ত্র মনে করা সম্ভব হইত। কারণ একজনের যেবস্তু সাক্ষাৎকারে যে অনুভূতি হয়, সেবস্তু সাক্ষাৎকারে অপরের সেই অনুভূতি হইবেই হইবে। আমাদের দেশের সাধকেরা ভগবানের এসকল দেবতারূপ-ধারণকে মায়িক বলিয়াছেন, সাধকের তৃপ্ত্যর্থে ভগবান এসকল রূপ ধারণ করেন। মায়াপ্রভাবে তিনি এসকল রূপ ধরিয়া সাধকের সমক্ষে উপস্থিত হন। এই মায়া, ইন্দ্রজাল, মিথ্যাকে সত্য রূপে দেখান। বাজিকরেরা এইরূপ অবস্তুকে বস্তুরূপে, একবস্তুকে অন্যবস্তুরূপে দেখাইয়া থাকে। ইহারা দর্শকের দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করে, তাহার বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া অসত্যে সত্য বোধ জন্মায়। ভগবানও তবে এইরূপই সাধকের তৃপ্তির নিমিত্ত তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া এসকল দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করেন। একথা

মানিলেও ভগবানের অসীম করুণারই প্রমাণ হয়, সাধক যাহা দেখেন তাহা যে সত্য, ইহার প্রমাণ হয় না। বরঞ্চ তদ্বিপরীতই প্রমাণ হয়। আর এসকল কল্পনার যেরূপ ব্যাখ্যাই করিনা কেন, এই কল্পনার ভূমিতেই যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মেতে যাবতীয় ভেদবিরোধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যোগ-সমাধি প্রভৃতি সাধনের উচ্চভূমিতেই আবার এসকল কল্পনার জন্ম হয়। এই জন্যই রাজা এসকলকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বকে ও ধর্ম্মসাধনকে জনগণের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায়, "প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত" ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

## সোজা পথ

আকুল পরাণ ক্ষণে ক্ষণে চম্‌কে ওঠে ;—কোন স্বপনে
ফুটেছে মোর পূজার মুকুল মৃণাল-কাঁটার মাঝে ?
শিশির-ঝরা পাতার মত নয়ন-তারা আপ্‌নি নত—
আরতি-দীপ জ্বল্‌ল কৈ আর এমন ধ্যানের সাঁঝে !

কি জপ জপি ! কি তপ তপি ! কোন্ বেদীতে অর্ঘ্য সঁপি ?
মন-দেউলে কোন্ অচেনা লুকায় আমার কাছে—
কোন্‌খানে কৈ দেখ্‌তে না পাই, নিখিল খুঁজে নিখিল হারাই,
কোন্ শুকান' অশ্রুধারায় পথ আঁকিয়া গেছে !

চল্‌ছি পথে দৃষ্টিহারা, যায় না কিছুই চিন্‌তে পারা,
কেউ ত ডাকে দেয় না সাড়া—বন্ধ বাঁশীর তান;—
দেয় না দেখা বন্ধু আমার, পথ-হারাণ শেষ অভিসার—
যুগযুগান্ত বিচ্ছেদে হায় শান্তিহারা প্রাণ।

শিউলি যেমন্ আধেক রাতে সব ঝরে' যায় আঙ্গিনাতে,
শিউরে ওঠে মর্ম্ম-ছেঁড়া ফুল-হারাণ বোঁটা,
তেম্‌নি আকুল আঁখির ঝারি, পথ চেয়ে আর রৈতে নারি,
গল্‌ছে খেদে কেঁদে কেঁদে অন্ধ আঁখির ফোঁটা।

শ্রীকরুণানিদান বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# ইরাবতী

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকের ইরাবতী এক সময়ে পাটরাণী ধারিণীর দাসী ছিল। কিন্তু তাহার চেহারাখানি ভাল; সে নাচিতে জানে, গাহিতে জানে, বেশ একটু রসিকতা করিতেও জানে। ক্রমে সে রাজার নজরে পড়িয়া গেল। সেকালে বহু-বিবাহ দোষের ছিল না, রাজা তাহাকে বিবাহ করিয়া রাণী করিয়া দিলেন। একেবারে দাসী হইতে রাণী! ইরাবতীর মাথাটা একটু বিগড়াইয়া গেল, তাহার উপর সে আবার একটু মদ ধরিল এবং সকলের উপর একটু প্রভুত্বও করিতে লাগিল। রাজার আদরের রাণী, সকলেই সহিয়া থাকিল।

ইরাবতী তো দাসী। সে রাজা রাজড়ার চাল কি বুঝিবে? পাটরাণী ধারিণী ইরাবতীর সর্ব্বনাশের জন্য একটু চাল চালিলেন।

যাহাতে ইরাবতীর উন্নতি, তিনি তাহাতেই ইরাবতীর অধোগতির উপায় করিলেন। তাঁহার এক ভাই ছিলেন রাজার সেনাপতি। তিনি বনের ভিতর ডাকাতের হাত থেকে একটি মেয়ে উদ্ধার করেন। সে মেয়েটি তিনি আপনার ভগিনীকে উপহার দেন। ভগিনী অর্থাৎ রাণী দেখিলেন মেয়েটি বড় সুন্দরী, বেশ বুদ্ধিমতী, একটু আধটু নাচ গানও জানে। তিনি একজন ভাল নাট্যাচার্য্য আনিয়া মেয়েটিকে ভাল করিয়া নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। কেন শিখাইতে লাগিলেন, কালিদাস কোথাও সেটি খুলিয়া বলিলেন না। কিন্তু প্রথমাঙ্কের প্রথম বিষ্কম্ভকে একজন চেটীর মুখে শুনাইয়া দিলেন, "বেশ্ বেশ্ এ যেন ইরাবতীকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ল।" সুতরাং রাণী যে ইরাবতীকেই অপদস্থ করিবার জন্য মালবিকাকে নাচগান শিখাইতেছিলেন একথা চেটীরাও জানিত। কিন্তু ইরাবতী ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। পাটরাণী ধারিণী ভাবিয়াছিলেন, একটা চাকরাণী রাণী হইয়া গিয়াছে, আর একটাকে রাণী করিয়া ওটাকে সরাইব। পাটরাণী মালবিকাকে খুব লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, রাজা যাহাতে কিছুতেই টের না পান। সে নাচগানে খুব পরিপক্ক হইলে তাহাকে রাজার সাম্‌নে যাইতে দিবেন।

কিন্তু দৈব মালবিকার অনুকূল। রাজা একদিন পাটরাণীর ঘরে তাহার একখানি ছবি দেখিয়া ফেলিলেন। দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, এ মেয়েটি কে? রাণী কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, রাজার একটি ছোট মেয়ে বলিয়া দিল, 'ও মালবিকা।' রাজা বিদূষকের সাহায্যে মালবিকাকে দেখিলেন এবং তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন। এখন ইরাবতীকে তাঁর আর মনে ধরে না।

বসন্ত আসিয়া উপস্থিত, ইরাবতী প্রমোদ-কাননে বসন্ত-শোভা দেখিবার জন্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল। বসন্তের প্রথম ফুল লাল কুরুবক বা ঝাঁটি ভেট্ পাঠাইলেন, আর বলিয়া পাঠাইলেন, 'রাজা যদি

আসেন দু'জনে একবার দোলায় চড়িব।' রাজা শুনিয়াই বিদূষককে বলিলেন, "না—যাওয়া হবে না। আমার মন যখন অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছে তখন ইরাবতী সেটা নিশ্চয়ই টের পাইবে, আর টের পাইলে রক্ষা থাকিবে না।" বিদূষক বলিল, "সেওকি হয়? আপনাকে সব রাণীরই মন যোগাইয়া চলিতে হইবে।" রাজা খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "তবে চল।" যাইতে যাইতে প্রমোদ-কাননের মধ্যেই মালবিকার সহিত রাজার দেখা হইয়া গেল। কবিরা বলেন, সুন্দরী যুবতী যদি আলতা পরিয়া সেই পায়ে অশোক-গাছে লাথি মারে তবে তাতে ফুল ফুটে। প্রমোদ-কাননের এক অশোক গাছে কিছুতেই ফুল ফুটে না। কথাটা ছিল রাণী ধারিণী একদিন আসিয়া ঐ গাছে পদাঘাত করিবেন। কিন্তু দোলা হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ব্যথা হইয়াছে, তিনি আসিতে পারিলেন না। তাই তিনি মালবিকাকে সাজাইয়া গুজাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সখী বকুলাবলী তাঁহার পায়ে আলতা পরাইতেছেন। তিনি একটা গাছের ছায়ায় একখানা পাথরের উপর বসিয়া আছেন। রাজা ও বিদূষক তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া লতার আড়ালে গেলেন। গিয়াই বিদূষক বলিলেন, নিকটে বোধ হয় ইরাবতীও আছেন। রাজা বলিলেন, হাতী জলে পড়িয়া যদি কমলিনী পায়, তবে কি আর সে হাঙ্গরের ভয় করে?

ইরাবতী এখনও রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে নাই। প্রবেশ করিলে রাজা তাঁহার কিরূপ আদর করিবেন, কবি এখন হইতেই তাহার একটু নমুনা দিয়া রাখিলেন। ক্রমে মালবিকার দু'পায়েই আল্‌তা পরান হইল। রাজা বলিলেন, এ আল্‌তাপরা পায়ে কা'কে কা'কে লাথি মারিতে পারে? হয় বাঁঝা অশোক গাছকে অথবা অপরাধী স্বামীকে? বিদূষক বলিলেন, তুমি অপরাধ করিতেছ, তোমাকেই মারিবে। রাজা বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ কখনও মিথ্যা হয় না।" রাজা যে ইরাবতীকে একেবারে সম্পূর্ণরূপ মন হইতে ছাঁটিয়া ফেলিয়া-

ছেন, সেইটি আগে দেখাইয়া কবি ইরাবতীকে রঙ্গমঞ্চে আনিতেছেন।

ইরাবতীর তখন বেশ একটু নেশা হইয়াছে, সঙ্গে তাঁহার চেটী নিপুণিকা আছে, সেও বোধ হয় মদ খাইয়াছে। কেন না মদটা একা খে'লে তত সুবিধা হয় না। ইরাবতী বলিতেছেন, নিপুণিকা লোকে যে বলে, মদটা স্ত্রীলোকের ভূষণ, একথাটা কি সত্য? নিপুণিকা বলিল, প্রথম একটা কথার কথা ছিল, কিন্তু এখন সত্য হইয়াছে। "তুমি একথাটা আমার প্রতি স্নেহ আছে বলেই বলিতেছ; সে যাহোক এখন বল দেখি, আমার আগে রাজা দোলাঘরে গিয়াছেন কিনা, সেটা কেমন করিয়া জানিব।"

"আপনার প্রতি তাঁহার যেরূপ অনুরাগ তাহাতে কি আর বুঝিতে বাকি থাকে?"

"মনযোগান কথা কো'য়ো না, অপক্ষপাতে কথা কও।"

"বিদূষক লাড়ু খাইবার লোভে একথা আগেই বলিয়া গিয়াছে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলুন।" তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া ইরাবতী টলিতে লাগিল ও বলিল, "আমার হৃদয় তো তাড়াতাড়ি করিতে চায়, কিন্তু আমার চরণ যে চলে না।"

"এইতো দোলাঘরে এসেছি—"

"নিপুণিকা কই আর্য্যপুত্রকে তো দেখিতেছি না।" "আপনি ভাল করে দেখুন, হয় ত আপনাকে পরিহাস করিবার জন্য কোথাও লুকিয়ে আছেন; আমরা প্রিয়ঙ্গু-লতার বেড়দেওয়া এই অশোক গাছের তলায় পাথরের উপর বসি।"

ইরাবতীর মনে রাজার প্রতি অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সে এখনও জানে রাজা তাহারই আছে। সে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছে, রাজা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন, আগেই আসিবেন। যখন দেখিতে পাইলেন না, তখন বলিলেন, কোথাও লুকাইয়া আছেন। খুঁজিতে লাগিলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবী দেখুন আমের বোল খুঁজতে গিয়ে পিঁপ্ড়ের কামড়াল।"

"সেকি ?"

"অশোক গাছের ছায়ায় বকুলাবলী মালবিকার পায়ে আল্‌তা "পরাইতেছে।"

ইরাবতীর একটু সন্দেহ হইল, "সে কি ? এত মালবিকার জায়গা নয়! সে কেমন ক'রে এল!" "রাণীর পায়ে ব্যথা হইয়াছে তাই তিনি বোধ হয় উহাকে পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ এইটাই খুব সম্ভব"।

"আর কি স্বামীর অনুসন্ধান করিবেন ? আমার পা তো আর অন্যত্র যেতে চায় না। আমার মদের নেশা এসে পড়েছে। কিন্তু যখন সন্দেহ হয়েছে, এটার শেষ দেখে যেতে হবে।"

বেশ করিয়া মালবিকার মুখখানি দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, "আমার হৃদয় যে কাতর হয়েছে তা ঠিক। কারণ রাজা যদি এ চেহারা দেখেন, আমার উপর আর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিবে না।"

ক্রমে ইরাবতী সেইখানে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ বড়ই বাড়িয়া গেল। একবার বকুলাবলী বলিল, "মালবিকা, তোমার পা দুখানি যেন লাল শতদলপদ্ম। তুমি যেন স্বামীর সোহাগের পাত্র হও।" শুনিয়া ইরাবতী নিপুণিকার দিকে চাহিতে লাগিল। সে চাহনির অর্থ এই, এ হল কি ? ক্রমে তিনি শুনিতে লাগিলেন রাজা মালবিকায় আসক্ত, মালবিকাও রাজার প্রতি আসক্ত, আর বকুলাবলী বৃন্দে দূতী সাজিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আমার আশঙ্কাটা তাহলে ঠিক্। যাহোক এখন তো সব টের পেলাম, এরপর যা করবার তা কর্‌ব।" তখনও ইরাবতীর সন্দেহটা যায় নাই, এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন পাটরাণীর হুকুমে অশোক গাছের জন্যই সে এসেছে। ক্রমে মালবিকা আসিয়া অশোক গাছে পদাঘাত করিল। রাজা বলিলেন, "অশোক গাছ ইঁহাকে কানের গহনা দেয়, ইনি তাহাকে চরণ দিলেন। লালে

লালে বেশ বিনিময় হইয়া গেল। যা বঞ্চিত আমিই হলাম। আমার তো কিছু দেবার নাই।" ক্রমে রাজা লতার আড়াল হইতে আসিয়া মালবিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নিপুণিকা বলিল, "দেবি! রাজা যে আসিলেন।" ইরাবতী বলিল, "আমারও মনে মনে এই সন্দেহটাই হচ্ছিল যে রাজা এর ভিতর আছেন।" ক্রমে মালবিকা নমস্কার করিলে রাজা নিজহাতে তাহাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন, "কঠিন গাছে তোমার এমন কোমল পাঁপাখানি দিয়াছিলে, না জানি তোমার কত কষ্ট হইয়াছে।"

ইরাবতী একথা শুনিয়া অত্যন্ত চটিয়া গেল, বলিল, আহাহা আর্য্যপুত্রের হৃদয় তো নয় যেন ননী। মালবিকা এখন চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত। বকুলাবলী বলিল, "রাজার অনুমতি লও।" রাজা বলিলেন, "যাবেই তো, আমার একবার ভিক্ষাটা শোন।" বকুলাবলী বলিল, "মন দিয়ে শোন, মন দিয়ে শোন, বলুন তো আপনি।" রাজা বলিলেন, "আমার আর কাহাতেও রুচি নাই। অশোকের যেমন ফুল হইতেছে না, আমারও তেমনি আর ধৈর্য্য হয় না। অশোককে যেমন স্পর্শ করিয়াছ, আমাকেও তেমনি স্পর্শ কর।" রাজার এই কথা যেমন বলা, আর অমনি ইরাবতীর সেইখানে আসা। আসিয়াই বলিল, "স্পর্শ কর, স্পর্শ কর, অশোকের ফুল তো ফুটল না, ইঁহার ফুল ফুটে উঠ্‌বে।" ইরাবতী বকুলাবলীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, এখন তুমি আর্য্যপুত্রের অভিলাষ পূরণ কর? বকুলাবলী ও মালবিকা তো একেবারেই চম্পট। রাজা বিদূষককে বলিলেন, এখন উপায়। বিদূষক বলিলেন, "জংঘাবল।"

ইরাবতী বলিল, "পুরুষের উপর কিছুতেই বিশ্বাস করা উচিত নয়। হরিণী যেমন ব্যাধের গীতে মুগ্ধ হইয়া আপনার সর্ব্বনাশ করে, সেইরূপ ইহার বঞ্চনা-বাক্যে আমি প্রতারিত হইয়াছি।" বিদূষক বলিলেন, "বয়স্য হাতেনাতে ধরা পোড়েছ। এখন আর উপায় নাই, যাহা হয় একটা কল্পনা ক'রে বল।" রাজা বলিলেন, "সুন্দরী মাল-

বিকার সঙ্গে আমার কি ? তোমার দেরী হচ্ছে দেখে কোন রকমে সময় কাটাচ্ছি।”

“আপনি অতি বিশ্বাসের কাজ করেছেন। আপনি যে সময় কাটাবার এখন উপায় পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না। জানিলে, আমি চিরদুঃখিনী, কখনও এমন কর্ম্ম করিতাম না।”

বিদূষক বলিয়া উঠিলেন—দেখুন রাণী, রাজা সকল রাণীকে সমান দেখেন, তা যদি তিনি সম্মুখে পড়িলে দেবীর পরিজনের সঙ্গে দু’টো কথাবার্ত্তা কন্, সেটা কি অপরাধের মধ্যে গণ্য হবে ? তাহলে আপনার সঙ্গেও তো কথাবার্ত্তা কহা হয় না।

“কথাবর্ত্তাই হোক, আমি আর কেন আপনাকে কষ্ট দিই” এই বলিয়া তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ইরাবতীর চন্দ্রহার খসিয়া পড়িতেছে, তথাপি সে চলিতে লাগিল। রাজা কহিলেন, “সুন্দরী, আমি তোমার একান্ত প্রণয়ী, আমার প্রতি তোমার নির্দ্দয় হওয়া ভাল দেখায় না।”

“তুমি শঠ, তোমার উপর আর বিশ্বাস করিতে পারি না”।

“আমায় শঠ বলিয়া তুমি অবহেলা করিতে পার, কিন্তু তোমার চন্দ্রহার তোমার পায়ে জড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছে, তুমি রাগ করিও না।”

“এ হতভাগাও দেখিতেছি তোমারি পথে যাইতেছে” এই বলিয়া চন্দ্রহার তুলিয়া লইলেন এবং রাজাকে তাহার বাড়ী মারিতে উদ্যত হইলেন।

একে ইরাবতী সুন্দরী, তাহাতে বেশ একটু মদে মুখ লাল হইয়াছে, তাহার উপর সে রাগে গর্‌গর্ করিতেছে, হাতে চন্দ্রহার উচাইয়া মারিতে যাইতেছে—এ অবস্থাতেও রাজা সেইরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন—“এই ইরাবতী, ইহার চোখ দিয়া শ্রাবণের ধারার ন্যায় জল ঝরিতেছে। ইঁহার চন্দ্রহার খসিয়া পড়িয়াছে, এ রাগে গর্ গর্ করিয়া সেই চন্দ্রহার তুলিয়া আমায়

প্রচণ্ড ভাবে মারিতে আসিতেছে—যেন মেঘমালা বিদ্যুতের দড়ী দিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতকে প্রহার করিতে আসিতেছে।”

“কেন তুমি বারবার আমায় অপরাধিনী করিতেছ?” রাজা তাঁহার হাত ধরিলেন ও বলিলেন, “আমি অপরাধ করিয়াছি, আমার দণ্ডবিধান করিতে আসিয়া কেন থামিয়া যাইতেছ? তোমার হাবভাব ইহাতে আরও খুলিতেছে, দাসের প্রতি কেন তুমি রাগ করিতেছ। আমি এখন যাহা করিতেছি তাহাতে বোধ হয় তোমার মত আছে” এই বলিয়া তিনি ইরাবতীর চরণে পতিত হইলেন। ইরাবতী বলিয়া উঠিলেন—“এত মালবিকার চরণ নয়, যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে ও আনন্দের লহর তুলিয়া দিবে?” এই বলিয়াই তিনি সখীর সহিত চলিয়া গেলেন।”

বিদূষক ঠাট্টা করিয়া বলিল, “বয়স্য উঠ, তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হয়েছেন।” রাজা তাড়াতাড়ি উঠিয়া ইরাবতীকে না দেখিয়া বলিলেন,—কি? চলিয়া গিয়াছে?

“তোমার অবিনয় দেখিয়া অপ্রসন্ন হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন, এস আস্তে আস্তে সরিয়া যাই। কে জানে মঙ্গল গ্রহের মত আবার ঘুরিয়া সেই রাশিতে উপস্থিত না হয়।”

রাজা বলিতেছেন, “প্রণয় কি বিষম। আমার মন মালবিকায় আকৃষ্ট। আমি পায়ে পড়িলাম তাতেও ইরাবতী প্রসন্ন হইল না, আমার পক্ষে ইহা ভালই হইয়াছে। সে আমায় বড় ভালবাসিত, সে যখন রাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আমি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।”

এইখানে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হইল। ইরাবতীরও এইখানে শেষ হইলে ভাল হইত। ইরাবতীর অপরাধ সে রাজাকে বড়ই ভালবাসিয়াছিল, ভাল বাসিয়া একটু উঁচাইয়া গিয়াছিল। এখন তাহার পতন হইল। কবি কিন্তু এই পতন দেখাইয়া খুসী হইলেন না। কবিরা বড় নিষ্ঠুর, ইরাবতীকে আরও যন্ত্রণা দিবেন, তাহারই ব্যবস্থা

করিলেন। ইরাবতী মনে যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতে সে আর যে কখন রাজার ত্রিসীমানায় যাইবে, তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সে যায়ও নাই। অত ভালবাসার এইরূপ পরিণাম হইলে, যাওয়া যায়ও না। তবু তাহার কিছু কিছু সান্ত্বনা তো আছে? কবি সে সান্ত্বনার পথগুলিও বন্ধ করিয়া দিলেন। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতী ও নিপুণিকা আবার রঙ্গমঞ্চে আসিলেন। আবার সেই দু'টী। নিপুণিকা খবর দিল বিদূষক সমুদ্রগৃহের বারাণ্ডায় শুইয়া ঘুমাইতেছে, চন্দ্রিকা একথা তাহাকে বলিয়া গিয়াছে। ইরাবতী বলিল, "একথাটা কি সত্য? নিপু-ণিকা বলিল, "সত্য না হইলে কি আপনাকে বলিতে পারি? তবে এস আমরা যাই।" বেচারা বড় বিপদে পড়িয়াছিল, বিদূষককে সাপে কামড়াইয়াছিল। তাহার খবর কার আর "আপনার আরও কিছু বলিবার আছে বোধ হয়?"

"আছে বৈকি?" সেখানে রাজার ছবি আছে, তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং প্রসন্ন হইতে বলিব। "এখনই কেন রাজার কাছে যাননা?" "যাহার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে সে আসলের চেয়ে নকল অনেক ভাল। আমার সৌজন্যের একটু অভাব হইয়াছিল, তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিব। তা ছবির কাছেই ভাল।"

ইরাবতী এই কথা বলিয়া নিপুণিকাকে বুঝাইল বটে, কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। সমুদ্র-ঘরে রাজার একখানি ছবি ছিল। সেখানি ইরাবতীর বিবাহের দিনের ছবি। ইরাবতীর বর্ত্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যৎও অন্ধকার। রাজা যে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, সে আশা নাই। আবার যে ভালবাসিবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাহার সহিত দোলায় চড়িবেন, সে আশা নাই। আবার যে তাঁহার সহিত প্রমোদ-কাননে বসন্তের ফুল দেখিয়া বেড়াইবেন, সে আশা নাই। কিন্তু সে তো রাজাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে না? সে যে এখন রাণী। রাজা যে একদিন

তাহাকে পায়ে রাখিয়াছিলেন, এখন তো সে দাসীপনা করিয়া কাল কাটাইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে, কিন্তু এখনকার রাজাকে সে ভালবাসিতে পারে না। এ রাজার মন অন্যের উপর পড়িয়াছে, সুতরাং এ রাজা ইরাবতীর কাছে কাঠ। সে বরং রাজার ছবির কাছে হাতজোড় করিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে কিন্তু এ রাজার কাছে যাইবে না। তাই সে সমুদ্র-গৃহে তাহার বিবাহের দিনের রাজার ছবি দেখিতে যাইতেছিল। সে এখন অতীতের স্মৃতি লইয়া থাকিবে। সেই সেকালের রাজাকে ভাল বাসিবে। তাহারই কাছে আপনার মনের কথা বলিবে, তাহারই কাছে মাফ চাহিবে। এই তাহার আশা, এই তাহার ভরসা, এই সুখেই সে যে-কয়দিন বাঁচিবে সুখী হইবে, এই স্মৃতিই তাহার জীবন হইবে। নিষ্ঠুর কবি, কালিদাস, তাহাকে এ সুখটুকু হইতেও বঞ্চিত করিবেন। যে সরিষা দিয়া ইরাবতী ভূত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে-ছিল, কালিদাস সেই সরিষার মধ্যেই ভূত আনিয়া দিলেন।

নিপুণিকা ও ইরাবতী যাইতেছেন, এমন সময় পাটরাণীর এক চেটী আসিয়া ইরাবতীকে বলিল, রাণী আপনাকে খবর দিয়াছেন যে এটা আমাদের সতীনিপনার সময় নহে। আমি তোমার প্রতি আদর দেখাইবার জন্য মালবিকা ও তাহার সখীকে আটক করিয়াছি। রাজার যদি কোন প্রিয় করিতে হয়, তুমি যখন বলিবে তখন করিব। এখন তোমার কি ইচ্ছা বল। চেটীর মুখে রাণীর এই আদরের খবর শুনিয়া ইরাবতী সত্য সত্যই গলিয়া গেল। সে ভাবিত রাণী তাহার সতীন, তাহাকে কষ্ট দিতে পারিলেই তিনি খুসী হন।

সে তখন বলিল, "মহারাণাকে পরামর্শ দিবার আমরা কে? তিনি আপনার দাসীকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছেন। আরও কথা, কার অনুগ্রহে আমি আছি, আমি বেড়েছি, আমি রাণী হয়েছি, সবই তো তাঁরই অনুগ্রহে।"

চেটী চলিয়া গেলে উহারা দু'জনে বিদূষকের কাছে গেল। দেখিল যে সে সমুদ্র-গৃহের দুয়ারে বাজারে বলদের মত ব'সে ব'সেই ঘুমুচ্ছে। তাহাকে ওভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া ইরাবতীর ভয় হইল বুঝি বা এখনও বিষের শেষ আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহা নহে, তাহার মুখ বেশ প্রসন্ন। এমন সময় বিদূষক স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ও মালবিকা' শুনিয়াই নিপুণিকা বলিল, এ হতভাগাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। চিরকাল আপনার স্বস্তিবাচনের মোয়া খেয়ে এখন কিনা মালবিকাকে স্বপ্ন দেখিতেছে। এমন সময়ে বিদূষক আবার বলিয়া উঠিল, "তুমি ইরাবতীকে ছাড়াইয়া উঠ।" এটা আর নিপুণিকা সহ্য করিতে পারিল না। বিদূষকের এক হেঁতালের লাঠী ছিল, সেটা আঁকা বাঁকা ঠিক সাপের মত। নিপুণিকা থামের আড়ালে থাকিয়া সেই লাঠীগাছটা বিদূষকের গায়ে ফেলিয়া দিল। ইরাবতী ইহাতে বড় খুসী হইল, ভাবিল বেইমানের উপর উপদ্রব করাই উচিত।

লাঠী গায়ে পড়িবামাত্র বিদূষক সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং "বয়স্য বয়স্য" বলিয়া রাজাকে ডাকিতে লাগিল। রাজা হঠাৎ সমুদ্র-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, বলিলেন, "ভয় নাই ভয় নাই।" সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাও আসিল, বলিল, "সাপ্ সাপ্ বলিতেছে, আপনি বাহির হইবেন না।" ইরাবতী রাজাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বকুলাবলী হঠাৎ বাহির হইয়া বলিল, "আপনি বাহির হইবেন না, সাপের মতই দেখা যাইতেছে।" ইরাবতী আর সহ্য করিতে পারিল না। থামের আড়াল হইতে রাজার নিকটে আসিয়া বলিল, আপনারা দিনের বেলায় যে সঙ্কেত করিয়াছিলেন, সেটা নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়াছে তো। বকুলাবলীকে বলিল, "বেশ বেশ তুই খুব দূতীগিরি কল্লি যা হোক।"

রাজা বলিলেন, "তোমার দেখছি অদ্ভুত সৌজন্য।" শুনিয়াই বিদূষক বলিল, "রাজা আপনাকে দেখিয়াই আপনার পূর্ব্ব ব্যবহার সব

ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু আপনি এখনও প্রসন্ন হন না কেন ?" ইরাবতী বলিলেন, "আমি রাগ ক'রেই বা কি কর্‌ব।" রাজা বলিলেন, "এযে অস্থানে রাগ, এটা কি তোমার পক্ষে সাজে ? বিনা কারণে তোমার মুখে কখনই তো রাগের চিহ্ন দেখা যায় না। পূর্ণিমা ভিন্ন চন্দ্রমণ্ডলে কি কখন গ্রহণ উপস্থিত হয় ?"

এ কথাগুলি ইরাবতীর মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিল। সে বলিল, "আর্য্যপুত্র, আপনি অস্থানে রাগের কথা যা বলিয়াছেন তা ঠিক। আমার যে সৌভাগ্য ছিল, সে যখন অন্য জায়গায় চলিয়া গিয়াছে, তখন যদি আমি রাগ করি লোকে যে হাস্‌বে।" রাজা বলিলেন, "তুমি উল্টা মানে কর্‌লে, আমি এতে রাগের কোন কারণই দেখ্‌তে পাইনে। আজ আমাদের উৎসব, তাই সব কয়েদী খালাস দিয়াছি, এ দু'টি মেয়ে খালাস পেয়ে আমাদের নমস্কার কর্‌তে এসেছে।" রাজা একটা বাজে কথা কহিয়া ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিতে গেলেন, কিন্তু ইরাবতী ঠাণ্ডা হইল না। তাহার মনে হইল রাণী ধারিণী যে খবর দিয়াছিলেন যে তিনি মালবিকাকে আটক্ করিয়াছেন, সেটা ঠিক নহে। সে নিপুণিকাকে বলিল, তুমি দেবীর কাছে গিয়া বল, আমি তাঁর পক্ষপাত আজ বেশ বুঝতে পার্‌লাম। নিপু-ণিকা কিছুদূর গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাস্তায় মাধবিকার সহিত আমার দেখা হইল, সেই এই কথা বলিয়া গেল।" বলিয়া ইরাবতীর কানে কানে সব কথা বলিল। তখন ইরাবতী বুঝিলেন রাণী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ঠিক। বিদূষক কৌশল করিয়া আটকান মেয়ে দু'টিকে বাহির করিয়া রাজার কাছে উপস্থিত করিয়াছে। সে বিদূষকের দিকে চাহিয়া বলিল, "ইনি এখন রাজার কামতন্ত্রের মন্ত্রী। এসকল ইহারই নীতি।" বিদূষক বলিল, "আমি যদি নীতির এক অক্ষরও পড়তাম তাহলে রাজাকে আমি কখন এমন কার্য্যে পাঠাতাম না।"

তৃতীয় অঙ্কের শেষে রাজাতে ও ইরাবতীতে একরকম কাটান

ছিড়ান হইয়া গিয়াছে। চতুর্থ অঙ্কে ইরাবতীর কপাল কেমন ভাঙ্গিয়াছে, সেটি দেখাইবার জন্য আর একবার রাজার সহিত তাহার দেখা হওয়া দরকার। তাই কালিদাস তাহাকে সমুদ্রগৃহে আনিয়াছেন। সে আসিয়া দেখিল সেই সমুদ্র-গৃহেই রাজা ও মালবিকা। যে স্মৃতিটুকু জাগাইবার জন্য সে এত ব্যস্ত হইয়াছিল, সে স্মৃতিটুকুও অন্ধকারময় হইয়া গেল। ইরাবতীর আর কিছুই রহিল না। তাহার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই গেল। কিন্তু একটা কথা হইতেছে, রাজা তো তৃতীয় অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সঙ্গে কাটান ছিড়ান করিয়া আসিয়াছেন, আবার কেন ইরাবতীর খোসামোদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল যে ইরাবতী ও ধারিণী দু'জনে মিলিয়া মালবিকাকে আবার কষ্ট দিবে। তাই তিনি ইরাবতীকে ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার যে ভয় হইয়াছিল, সেটি বিদূষকের একটি কথায় প্রকাশ হইয়াছে। যখন ইরাবতী নিপুণিকাকে ধারিণীর নিকট পাঠাইল, তখন বিদূষক মনে মনে করিল—হায় হায় বাঁধন খুলে পায়রা বিড়ালের মুখে গিয়ে পড়্‌ল।

কিন্তু ইরাবতী তেমন মেয়ে নয়। সে যে মালবিকার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিবে, তাহার সে প্রকৃতিই নয়। সে আপনার সুখে আপনি মত্ত ছিল, এখন আপনার দুঃখে মরমে মরিয়া থাকিল। সমস্ত বইখানায় ইরাবতী মালবিকার সহিত একটিবারও কথা কহে নাই। বরং অশোক-তলায় মালবিকার মুখখানি দেখিয়া তাহার মনে হইয়াছিল, এমুখ দেখিলে রাজা তাহাকে হয় ত ভুলিয়া যাইবেন। ইরাবতী একেবারে ক্রূর, খল বা কপট নহে। চতুর্থ অঙ্কের শেষে যখন জয়সেন আসিয়া খবর দিল, রাজার মেয়ে বসুলক্ষ্মী বানর দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছে এবং ক্রমাগত কাঁপিতেছে। তখন ইরাবতীই সর্ব্বাগ্রে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য দৌড়িল এবং রাজাকেও শীঘ্র যাইবার জন্য অনুরোধ করিল।

চতুর্থ অঙ্কের শেষে ইরাবতীর সর্ব্বনাশ করিয়া পঞ্চমাঙ্কে কবি

আর ইরাবতীকে আনিলেন না। রাণী কয়েকবার ইরাবতীর নাম রাজার কানে তুলিয়া দিলেন, কিন্তু ইরাবতী রঙ্গমঞ্চে আর আসিল না। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহাদি হইয়া গেলে নিপুণিকা আসিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ইরাবতী আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি আপনার সম্মান রাখেন নাই, তজ্জন্য তিনি অপরাধিনী হইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে স্বামীর অনুকূল কার্য্যই করা হইয়াছে এবং আপনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া, তাহার মান রক্ষা করি-বেন। রাজা একথার কোনই উত্তর দিলেন না। ইরাবতীকে আর তাঁহার মনে নাই। তিনি এখন মালবিকাময় হইয়া উঠিয়াছেন। এখন অপরাধিনী ইরাবতীরও যে দশা, নিরপরাধিনী সর্ব্বস্বত্যাগিনী মহারাণী ধারিণীরও সেই দশা। তাই তিনি নিপুণিকাকে জবাব দিলেন, "আর্য্যপুত্র তাহার সেবা জানিবেন।" নিপুণিকা, অনুগৃহীত হইলাম বলিয়া প্রস্থান করিল। যে ইরাবতীর সৌভাগ্য দেখিয়া একসময় রাজপরিবারের সকলেই হিংসায় মরিত, সেই ইরাবতী একেবারে লোপ হইয়া গেল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

# পিরীতি

১।

পিরীতি পিরীতি, কি তার প্রকৃতি, কেমন মূরতি ধরে ?
পিরীতির কথা, কহে যথা তথা, কেহ কি দেখেছে তারে ?
এ অঙ্গে অনঙ্গে, - সদা এক সঙ্গে, রঙ্গে বসতি করে।
এরূপে অরূপে মিলায়ে স্বরূপে, রসের মুরতি ধরে ॥
নিজ রসে মজি, এ মুরতি ভজি, সহজে পিরীতি পায়।
রসতনুখানি, রসের পরাণি, রসেতে ভাসিয়া যায় ॥

২।

কি বলিব সখি, বলিবার এ কি, বলিলে বুঝিবে কে ?
গুণ বিপরীত, মিলায়ে বিধাত, গড়েছে পিরীতি দে' ॥
এই ত বয়ান জুড়ায় পরাণ, তবু যেন এই নয়।
এ রুচির দেহ বাড়াইছে লেহ, এ নহে মরমে কয় ॥
এ রূপ দরশে আঁখি অনিমেষ, নারি তবু দেখিবারে।
এ তনু পরশে হইনু অবশ, ছুঁতে নারি তবু তারে ॥
এই অঙ্গ গন্ধ নাসা করে অন্ধ, মিটে না পিয়াসা কভু।
এই কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি রসায়নী, শ্রবণ পূরে না তবু ॥
এ মানুষই হয়, এ মানুষ নয়, হেঁয়ালি ভাঙ্গিবে কে ?
অঙ্গেরে ধরিয়া, অনঙ্গে পাইয়া, পিরীতি জানয়ে সে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

# কঠোর সমালোচনা

সম্প্রতি এক ধূয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন এখনও আসে নাই। এই ধূয়া যাঁহারা ধরিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রণী হইতেছেন—স্যার রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ গত বৈশাখের 'ভারতী'তে স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন,—"বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না। এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলোকে গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে ইহার উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না। এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিন আসে নাই। যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে। অথচ দেখিতে পাই বালক-বাংলা সাহিত্য যেন অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর হাতে চারিদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভুল—কেননা, বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোঁচা তাহাকে হয়রাণ করিয়া মারিতেছে।"

প্রথমেই বলিয়া রাখি, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সমালোচনার সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি এরূপ মতের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রায় ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্কিমের কঠোর সমালোচনার সমর্থন করিতে যাইয়া 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট খাট কাঁটাগুল্ম-জঙ্গলকে সে তীব্র কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্ম জঙ্গল অনাদরে জন্মে, তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

কারণ, তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হৌক্ সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয়-মন্দয় এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্ব্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।"

বলা বাহুল্য, এখন তিনি ঠিক ইহার উল্টা সুর ধরিয়াছেন। কঠোর সমালোচক এখন তাঁহার চক্ষে আর কর্ত্তব্যপরায়ণ মালী নহে;—এখন তিনি তাহাকে গোরু ছাগল বলিয়া গালি দিতেছেন। আরও হাসির কথা এই যে, যিনি কঠোর সমালোচনার বিরুদ্ধে এত বলিয়াছেন, সংযম ও শ্লীলতার এত উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই মুখে গালাগালির উচ্ছ্বাস!—ইহাতে শুধু হাসি আসে না,—দুঃখও হয়। দুঃখ—কঠোর সমালোচনার অভাব অনুভব করিয়া। যে বিচার-বিশ্লেষণের অগ্নিপরীক্ষায় স্বাস্থ্যকর শিক্ষা এবং সংশোধিত শক্তি ও সংযম লাভ হয়, এদেশে তাহার ঠিকমত প্রচলন থাকিলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে আজ একটু সংযত হইয়াই কথা কহিতে হইত।

কঠোর সমালোচনার দিন যে এখনও কেন আসে নাই, ইহার. অবশ্য যুক্তি দিতে রবীন্দ্রনাথ ভুলেন নাই। যুক্তি এই যে, 'বাংলা সাহিত্যকে আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি না।'

কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে কথাটা খুব ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এদেশে কঠোর সমালোচনা যা' একটু দেখিতে পাই, তাহা প্রধানতঃ কবিতার উপরেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই কাব্য-সাহিত্যের বয়স নিতান্ত কাঁচা নয়। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে, যে দেশে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির মতন কবি জন্মিয়া গিয়াছেন, সে দেশের সাহিত্যের বয়স পাকা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আর এই বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের দেশে আধুনিক ন্যাকামীপূর্ণ কবিতার প্রচলন দেখিয়া যদি কেহ তাহার নিন্দা করে, তাহা হইলে এই নিন্দার বিরুদ্ধে কোনও যুক্তিসঙ্গত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রবীন্দ্র-

নাথ এই নিন্দাকারীকে গোরু-ছাগলের সামিল মনে করিলেও তাহার নিন্দা যে সত্য, ইহা কিছুতেই তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সমালোচনা জিনিসটা এদেশে পূর্ব্বে ছিল না। স্বভাবের নিয়মে—অনুরাগের আকর্ষণেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ছাপাখানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থকার হইবার সখ্ ও গ্রন্থ ছাপিবার পয়সা, এই দুইটির সংযোগ যাঁহাতে ঘটিত, তিনিই পুস্তক প্রকাশ করিতেন। ফলে, মন্দ পুস্তকের ভাগটা খুব বেশী হইয়া পড়ে। এই মন্দ পুস্তকের কবল হইতে পাঠকসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং ভাল পুস্তকের প্রচারকল্পে তখন স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁহাদের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রে পুস্তক-সমালোচনার রীতি আরম্ভ করিয়া দেন। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় "বিবিধার্থ সংগ্রহে" লিখিয়াছিলেন,—"কি বিদ্যালয়স্থ শিশু কি অপ্রাপ্ত-ব্যবহারাশ্রমস্থ অপোগণ্ড বালক সকলেই গ্রন্থকার-গৌরব লাভার্থ ব্যাকুল, এমন কি, বর্ণপরিচয়বিহীন অপকমতিরাও গ্রন্থকার নামে পরিচিত হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের বায়সাধন করিয়া যাহা ইচ্ছা মুদ্রিত করিতে পারিলেই গ্রন্থ নামে বিখ্যাত হইবে এবং যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, গ্রন্থ সংগ্রহকারী সহৃদয়কে অবশ্যই ক্রয় করিতে হইবে। এই ভয়ানক ব্যভিচারের মূল কি? ইহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিতে গেলে কেবল সমালোচন-প্রথার অসঙ্গতি—এই দোষের নিদান, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে।"—এই দোষ দূর করিবার আশায় তিনি ও রাজেন্দ্রলাল, দুই জনে মিলিয়া কড়া সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেন। এজন্য তাঁহাদিগকে অবশ্য অনেক লেখকের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইয়াছিল—অনেকের নিকট গালাগালিও খাইতে হইয়াছিল। কিন্তু গালি খাইয়া তাঁহারা সত্য বলিতে কখনও ভয় পান নাই। মাঝে মাঝে শুধু একটু দুঃখ করিয়া লিখিতেন,—"সত্য বলিলে বন্ধু বিগড়ে।"

তারপর বঙ্কিমের আমলে লেখকের উপদ্রব আরও বাড়িয়া উঠিল। তিনি দুঃখ করিয়া লিখিলেন,—"আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তান-সন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য, সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না।"—এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' সজোরে চাবুক চালাইতে ত্রুটি করেন নাই। পরে তাঁহার অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও 'বঙ্গদর্শনে' কিছুদিনের জন্য সেই চাবুকের জের চালাইয়াছিলেন।

তারপর 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হইল। যাঁহারা বঙ্গদর্শনের চাবুক খাইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা এখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অনেকে আবার কেঁচে কলম ধরিলেন। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন চলিল না। কয়েক বৎসর যাইতে না যাইতে সুরেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চাবুক হস্তে সাহিত্যের অঙ্গনে দেখা দিলেন। 'সাহিত্য' ও 'সাধনা'র পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলেই একথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

আজ কিন্তু সহসা রবীন্দ্রনাথের প্রাণ বাঙ্গালী লেখকদের জন্য কাঁদিয়া উঠিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনিই অথচ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এদেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোন যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমত নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।"

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যেজন্য দুঃখ করিয়াছিলেন, দুঃখের সেই কারণ এখন ক্রমশঃ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথ এখন উপদেশ দিতেছেন,—"যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না, তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে।" কেন? পাঠক-বেচারী—যাহারা ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়ে, তাহাদের সহিত প্রতারণা করাই কি তবে সমালোচকের ধর্ম্ম? সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন কি তবে একাকার হইয়া যাইবে? কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ্য করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই স্বল্প আঘাতের ফলে যে তাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সেকথা তিনি আজ কেন বিস্মৃত হইতেছেন? কেন ভুলিয়া যাইতেছেন যে, রাহুর কবলে না পড়িলে তাঁহার 'কড়ি ও কোমলে'র দ্বিতীয় সংস্করণ অতটা আবর্জ্জনা-বর্জ্জিত হইত না?

তাই বলিতেছি যে, তাঁহার আগেকার মতই সত্য। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, "এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।"

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

---

## মহাযাত্রা

[ ৺পুরীধামে লিখিত ]

১

দারা পুত্র পরিবৃত বাসনার বাড়ী
ফেলে' এস পিছে ;
চলে এস সংসারের ক্ষণ সুখ ছাড়ি,'
সে যে স্বপ্ন মিছে !
শ্রান্ত যদি পান্থ, তব সাধন-পন্থায়
পাবে ধর্ম্ম-শালা ;
বিশ্রাম করিও তথা আসিয়া সন্ধ্যায়,
জুড়াইবে জ্বালা ।

২

ধেয়ে চল পান্থ, এবে নাচিতে নাচিতে
আনন্দের পুরী ;
'জয় জগন্নাথ' বলি' বাঁধ গো ত্বরিতে
গলে প্রেম-ডুরী ।
অন্ধ করে আঁখি যদি নয়নের জল,
ফেল তা মুছিয়া ;
কণ্ঠ যদি গদ গদ, অঙ্গ টলমল,
রুদ্ধ কর হিয়া ।

৩

দারুসম কর দেহ বহির্ভাব-হীন,
অন্তর্মুখী মন,
উন্মীলিত কর ধীরে পলক-বিহীন
ধ্যানের নয়ন।
এইবার দারু-ব্রহ্ম কর দরশন
চিন্ময় শরীর,
ভাবাভাব-বিবর্জ্জিত বিরাট বদন
আনন্দ-গভীর।

৪

তার পর চল পান্থ, মহাযাত্রা করি'
সিন্ধুর সন্ধানে,
কূলে তার স্বর্গ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করি'
মৃত্যুর শ্মশানে।
চল দ্রুত সূক্ষ্মদেহে ভোগ-অবসানে
কালার্ণব-পার—
নাহি যথা জন্ম, মৃত্যু, কাল, রূপ, নামে
দ্বন্দ্ব অনিবার!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

# নিধু গুপ্ত

উপক্রমণিকা।

ভাষা-জননীর স্তব-স্তুতি করিয়া এদেশে এখন যে সব গীত রচিত হইতেছে, তাহার মূল নিধুবাবুর সঙ্গীতে। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে—সেই সুদূর অতীতে, এই বাঙ্গালী কবির গানেই 'মাতৃসম মাতৃভাষা' ভাবটা সর্ব্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল। অথচ সে সময়ে এদেশে মাতৃভাষার কোনই আদর ছিল না।—পণ্ডিতমণ্ডলীর অশ্রদ্ধায় ও ধনী-সমাজের অবহেলায় উহা তখন একান্তই ম্রিয়মাণা। কিন্তু ভাষার সেই দুর্দ্দশার দিনেই নিধুর মধুর কণ্ঠে বাঙ্গালী শুনিল :—

'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা,  
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?  
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর—  
ধারাজল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?'

কেবলমাত্র এই টুকুই তাঁহার পরিচয় নহে। নিধুবাবু ওরফে রাম-নিধি গুপ্ত বাঙ্গালা দেশের সরিমিঞা।/ বাঙ্গলা টপ্পার তিনিই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুধু সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলে সব বলা হয় না,—এক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। নিজে কবিওয়ালা না হইলেও কবিওয়ালাদের তিনি গুরু। রামবসু হরুঠাকুর প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালারা তাঁহারই অনুসরণ করিয়া অনেক অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আসল কথা,—যে প্রতিভা দেশ ও কালের প্রভাব বিজয় করিয়া, দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি করিয়া চরিতার্থ হয়, নিধুবাবু সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের যখন মৃত্যু হয়, তখন নিধুর বয়স বেশী না হইলেও নিতান্ত কম ছিল না।—তখন

তিনি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের এক যুবক। সে সময়ে ভারতের খুব নাম—খুব মান। সে নাম ও মানের বহর নিধুবাবু নিজ চক্ষেই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা দেখিয়াও, ভারতের পথে পদবিক্ষেপ করিতে তিনি প্রলোভিত হন নাই। ভারতের প্রভাব তাঁহাকে বিন্দু-মাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। নিজ প্রতিভাবলে তিনি নূতন পথ তৈয়ারী করিয়াছিলেন—নূতন ধরণের এক সুর বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্যে আনিয়া দিয়াছিলেন।—ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব! এ কৃতিত্ব উপেক্ষার যোগ্য নহে।

কিন্তু প্রতিভা জিনিসটাকে চিনিবার শক্তি আমাদের এতই কম যে, এ হেন যুগপ্রবর্ত্তনকারী শক্তিশালী কবিকেও ভুলিবার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম। 'নিধু অশ্লীল' 'নিধু vulgar' এই কথাই একদিন আমাদের মুখের বুলি হইয়াছিল। জীবিতকালে তিনি তেমন উপেক্ষিত হন নাই, একথা সত্য। কিন্তু মৃত্যুর কিছু-কাল পর হইতেই, ইংরাজী-শিক্ষিত-বাঙ্গালী-সমাজে তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি কমিতে আরম্ভ হয়। ঈশ্বরগুপ্ত, রাজনারায়ণ ও রামগতি প্রভৃতির ন্যায় দুই চারিজন রসজ্ঞ লেখক ছাড়া তখনকার কালে আর কেহ বড় একটা মুখ ফুটিয়া তাঁহার সুখ্যাতি করেন নাই। বঙ্কিমের আমলে এই উপেক্ষার ভাবটা যেন আরও বাড়িয়া উঠে। তাঁহার সমগ্র রচনার মধ্যে নিধুর নাম মনে হইতেছে একবার মাত্র দেখিয়াছি—তাহাও আবার উপন্যাসে। তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'র এক-স্থলে আছে,—"বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গাইব?' তখন শ্রোত্রী-গণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন। কেহ চাহিলেন 'গোবিন্দ অধিকারী'—কেহ 'গোপাল উড়ে।' যিনি দাশরথির পাঁচালি পড়িতে-ছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন।...কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, 'নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না'।"—এই লেখাটুকুর মধ্যে নিধুর প্রতি বঙ্কিমের অশ্রদ্ধার ভাবটাই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। গোপাল উড়ের গান-ফরমায়েসকারিণীকে বঙ্কিম-

চন্দ্র কোনও বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই, অথচ যে স্ত্রীলোকটি হরিদাসী বৈষ্ণবীকে নিধুর টপ্পা গাহিতে অনুরোধ করেন, তাঁহাকে তিনি 'লজ্জাহীনা' বলিয়াছেন! কিন্তু কি কবিত্ব বা কি শ্লীলতা, কোন গুণেই নিধুর টপ্পার নিকট গোপাল উড়ের গান দাঁড়াইতে পারে না। যদি লজ্জাকর কিছু থাকে, তবে তাহা গোপাল উড়েতে আছে, দাশরথিতেও আছে, কিন্তু নিধুগুপ্তে নাই। নিধুকে 'বয়কট' করিতে হইলে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকেও কাব্য-সংসার হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হয়। যাঁহারা বৈষ্ণব কবিতাকে ভাল বলেন, অথচ নিধুকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা যদি রাধা-কৃষ্ণের নামে বেনামী করিয়া নিধু পড়েন, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তির কিছু পাইবেন না।

শুধু বঙ্কিম নহেন, সে সময়ে রমেশচন্দ্র ও হরপ্রসাদ প্রভৃতির লেখাতেও নিধুর প্রতি ঐ অশ্রদ্ধা বা উপেক্ষার ভাব বেশ প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে "The Literature of Bengal" নাম দিয়া রমেশচন্দ্রের যে একখানি দুই শতাধিক পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার কোথাও নিধু বা কোন কবিওয়ালার নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ, যে গ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন, সে গ্রন্থে—অর্থাৎ, রামগতির "বাঙ্গলা-ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকে, নিধুর এবং দুই-চারিজন কবিওয়ালার কথা খুব প্রশংসার সহিতই উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে নিধুর নামোল্লেখ করেন বটে, কিন্তু তাহা করার চেয়ে না করাই বোধ করি ভাল ছিল। কেন না, নিধুকে অমন স্পষ্ট ভাষায় অযথাভাবে অপদার্থ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা আর কখনও কোন লেখককে করিতে দেখি নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"সাহিত্য একেবারে রহিল না; ভারতচন্দ্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। রামপ্রসাদ সেন এই সময়ে পরলোক গমন করেন, গঙ্গাভক্তি-

তরঙ্গিণী প্রণেতা দুর্গাপ্রসাদও তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গামী হন। তাঁহাদের স্থান অধিকার করে এমন লোক একেবারে হইল না, যে দুই-একজন রহিলেন, তাঁহাদেরও প্রতিভা সম্পূর্ণ বিকাশ হইল না। তাঁহারা অতি নীচ শ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ করিতে লাগিলেন মাত্র। আপনারা কি নিধুবাবু, রামবসু প্রভৃতিকে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের স্থান পাইবার যোগ্য মনে করেন?"

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সমালোচনাটুকু পড়িয়া মনে হয় যে, নিধুর সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁহার একটুও পরিচয় নাই। নিধুকে ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ অথবা দুর্গাপ্রসাদের আসনে বসাইতে পারা যায় কিনা, জানি না; কিন্তু তিনি যে 'অতি নীচশ্রেণীর কবিতা লইয়া করতোপ' করিতেন, একথা বলিলে সত্যের অবমাননা করা হয়। তিনি বিদ্যা বা সুন্দর কিম্বা মালিনীর মত কিছু গড়িয়া যান নাই বটে, কিন্তু তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, ভারতচন্দ্রাদিতে তত্তুল্য কিছুই দেখিতে পাই না। নিধুবাবু খাঁটি আদিরসের কবি। ভারতচন্দ্রের আদিরস প্রকৃত আদিরস নহে। নিধুর টপ্পা প্রকৃত আদিরসাত্মক বলিয়াই উহা কামের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য্যরূপে প্রেমের উদ্রেক করে। কিন্তু ভারতচন্দ্র পড়িবার সময় প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না বাড়িয়া দারুণ অশ্রদ্ধা ও বিরক্তিই জন্মে। নিধু প্রেম উদ্দীপ্ত করেন। ভারত কামকে প্রদীপ্ত করেন। আরও একটি দোষ হইতে নিধুবাবু মুক্ত। আধুনিক কবির প্রেম-কবিতায় সচরাচর যে দোষ দেখা যায়, নিধুতে তাহা নাই। আধুনিক কবির—

"দূরে রও ঊর্দ্ধে রও দেবী হ'য়ে পূজা লও
পূজিবার দেহ অধিকার।
এর বেশী নাহি চাই এও কেন নাহি পাই
এও কেন অদেয় তোমার।"

—এ জিনিস নিধুবাবুতে পাওয়া যায় না। ইহাও প্রকৃত আদিরস নহে—আদিরসের কতকটা বিকৃতি। কারণ, প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে লালসা, তাহা ইহাতে নাই। যতদিন দেহ আছে, ততদিন দেহের সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য হইয়া মনের কোন বৃত্তিরই চালনা হইতে পারে না। নিধুর টপ্পা দেহকে আশ্রয় করিয়া জাগে, আবার দেহকেই ছাড়াইয়া যায়। ইন্দ্রিয়েতে জন্মিয়া, ইন্দ্রিয়কে ছাড়াইয়া, তাহা বিশুদ্ধ রস-রাজ্যে উপনীত হয়।—তাঁহার প্রেম-সঙ্গীতে আছে,—

'ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে'

আদিরস এখানে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। উহাতে বিদ্যা-সুন্দরের হীন প্রবৃত্তি সকলের অসংযত উদ্দাম-লীলা-তরঙ্গ নাই, অথচ উহাতে উপরোক্ত আধুনিক কবির স্বপ্নময় কল্পনার অলীক প্রেমের আভাসও নাই। উহা প্রকৃত, পবিত্র ও অমূল্য। বঙ্কিম বলেন—"প্রকৃত আদিরস জগতের একটি দুর্ল্লভ পদার্থ।"—এই দুর্ল্লভ সামগ্রী নিধুবাবু এদেশে অজস্র পরিমাণে ছড়াইয়া গিয়াছেন। দেশের বড় বড় লেখকেরা কেন যে এমন 'দুর্ল্লভ পদার্থ'কে উপেক্ষার ও অশ্রদ্ধার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুঝিতে পারি না।

তবে একটা এই আশ্বাসের কথা, এবং কতকটা মজার কথাও বটে যে, মুখে নিধুকে উড়াইতে চেষ্টা করিলেও, মন হইতে আমরা কেহই তাঁহাকে তাড়াইতে পারি নাই। এমন কি, এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা গিরিশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ও অন্যান্য কবিওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। একথার প্রমাণস্বরূপ এইখানে দুই একটা নমুনা দিলাম।

নিধুবাবু গাইয়াছেন,—

“আমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল,
ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল।”

তারপর রামবাবু গাইয়াছেন—

“মনে রহিল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলি আর বলা হ'ল না।”

তারপর রবীন্দ্রনাথে দেখিতে পাই—

“হলোনা হলোনা সই
মরমে মরম লুকান রহিল বলা হ'ল না;
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হলোনা হলোনা সই।”

বাঙ্গালার সাহিত্য-সমাজে আর একটা ভাব লইয়া কিরূপ কাড়া-কাড়ি হইয়াছে দেখা যাউক :—

নিধু গুপ্ত গাইয়াছেন—

‘আমি মাত্র এই চাই, মরি তাহে ক্ষতি নাই
তুমি আমার সুখে থেকো, এ দেহে সকলি সবে।’

তারপর রামবাবু গাইয়াছেন,—

‘তুমি যা'তে ভাল থাক সেই ভাল
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।’

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন,—

‘তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল।’

ইহা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের “হৃদয় আমার হারিয়েছে” ও গিরিশ-চন্দ্রের “না জানি সাধের প্রাণে কোন্ প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসী” প্রভৃতি গান নিধুর “মনপুর হতে আমার হারায়েছে মন” ও “আদরে

সাধ করে, দিলাম প্রেমের বেড়ী পায়” প্রভৃতি গানকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নিধুর সঙ্গীতের সহিত আধুনিক বাঙ্গলা প্রেম-কবিতার এই ধরণের লাইনের মিল যে কত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। বাহুল্যভয়ে, সে সব আর উদ্ধৃত করিলাম না।

আসল কথা, সৌন্দর্য্য যাহার প্রাণ—নিত্য রসে যাহা টলটলায়মান, তাহার বিনাশ নাই। মেঘ চাঁদকে যতই ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করুক; চাঁদই স্থায়ী—মেঘ স্থায়ী নহে। নিধুর গান যে এত ঝড়-ঝাপটা খাইয়াও আজও টিঁকিয়া আছে, সে শুধু তাহার রসের গুণে। সে রসের কথা—সে কবিত্বের কথা, পরে আলোচনা করিতেছি।—এখন তাঁহার জীবন-কথা যতটুকু জানি, তাহাই বিবৃত করা যাউক। কারণ, কবিকে চিনিতে পারিলে,—কবির সমসাময়িক দেশের ও সমাজের অবস্থা জানিতে পারিলে, কবির যাহা কীর্ত্তি, অর্থাৎ গান বা কবিতা, তাহা বুঝিতে একটু সুবিধা হইবে।

## সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা।

নিধুবাবু কোন্ সময়ের লোক, সে খবর এদেশের অনেকেরই জানা নাই। শুধু তাহাই নহে। বলিতে লজ্জাও হয়, হাসিও আসে—নিধু যে এক মানুষের নাম, একথাও ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে অনেক বাঙ্গালীই জানিতেন না। তাই দুঃখ করিয়া গুপ্ত-কবি তাঁহার ‘প্রভাকরে’র পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন,—“অনেকেই ‘নিধু’ ‘নিধু’ কহেন, কিন্তু ‘নিধু’ শব্দটি কি, অর্থাৎ এই নিধু কি গীতের নাম, কি সুরের নাম, কি রাগের নাম, কি মানুষের নাম, কি, কি?—তাহা জ্ঞাত নহেন।”

সুখের বিষয়, এই দুঃখ যিনি করিয়াছিলেন, তিনিই ‘প্রভাকরে’র পৃষ্ঠায় নিধুবাবুর এক অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে রচনার নিকট আমরা কিয়ৎপরিমাণে ঋণী।—এজন্ত

প্রথমেই স্বর্গীয় কবিবরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

নিধুগুপ্ত খাঁটি সেকেলে বাঙ্গালী। পলাশির যুদ্ধের প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে, পৌষমাসে, রামনিধিগুপ্ত ত্রিবেণীর সন্নিহিত চাঁপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিবেণী বাঙ্গালায় এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দেশ। বঙ্কিম তাঁহার গুরু গুপ্ত-কবির জন্মস্থানের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"প্রয়াগে মুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্য-ক্ষেত্রমধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্বপারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চন পল্লী" বা কাঁচরাপাড়া। কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।"—বঙ্কিমচন্দ্র 'ত্রিবেণী'র পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু সে অঞ্চলেও যে অনেক বৈদ্যের বাস, তাহা বলেন নাই। এ অঞ্চল রামনিধির জন্মস্থান বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে পারে।

তবে একটা কথা এই যে, তিনি ত্রিবেণী-অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিলেও, সেখানে বেশীদিন বাস করেন নাই। তাঁহার পৈতৃক ভিটা ছিল কলিকাতার কুমারটুলিতে। এইখানে তাঁহার পিতা ৺হরিনারায়ণ গুপ্ত ও পিতৃব্য ৺লক্ষ্মীনারায়ণ গুপ্ত, এই দুই সহোদরে কবিরাজী করিতেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা-অঞ্চলে বর্গীর উপদ্রব যখন অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, তখন তাঁহারা ভয়ে কলিকাতার বাসভূমি ত্যাগ করিয়া সপরিবারে চাঁপতা গ্রামে মাতুলালয়ে পলায়ন করেন।—পিতার এই মাতুল গৃহেই নিধুর জন্ম হয়। প্রায় সাত

বৎসর কাল এখানে তাঁহারা বাস করেন। এইখানেই নিধুর হাতে খড়ি হয়। এই গ্রামের এক পাঠশালায় তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন। বৎসর দুই মধ্যে তাঁহার পাঠশালার পড়াও এক প্রকার শেষ হয়।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে, নবাব আলিবর্দ্দীর চেষ্টায় বঙ্গদেশ হইতে বর্গীর দল যখন বিতাড়িত হইল, ৺হরিনারায়ণ কবিরাজ সপরিবারে তখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে আর পাঠ-শালায় ভর্ত্তি করিলেন না। তাঁহার সাধ ছিল—নিধু একটু ইংরেজী লেখা-পড়া শিখে—এবং শিখিয়া ইংরাজের কুঠিতে কাজ-কর্ম্ম করে। তাই তিনি কলিকাতার এক পাদ্রী সাহেবের হাতে নিধুর বিদ্যা-শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। সাহেব নিধুকে সুশীল ও মেধাবী দেখিয়া অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন।

নিধুবাবুর সর্ব্বশুদ্ধ তিন বিবাহ। বাইশ বৎসর বয়সে সুখচর গ্রামে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। এই বিবাহের অনতিকাল পরেই তাঁহার চাকরী করিবার সাধ হয়। সেই সময়ে তাঁহার প্রতিবেশী দেওয়ান রামতনু পালিত মহাশয় তাঁহাকে ছাপরায় লইয়া যান, এবং সেখানে কালেক্টারী আফিসে একটি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত করিয়া দেন।

ছাপরায় আসিয়া নিধুর সঙ্গীত-শিক্ষা-ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। বাল্যকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতের পরম পক্ষপাতী ছিলেন। কোন স্থানে গান হইতেছে দেখিলে বা শুনিলে তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন। গান ভাল লাগিলে, তাঁহার আহার-নিদ্রার কথা কিছুই মনে থাকিত না। তিনি বাল্যকাল হইতে সঙ্গীত-শিক্ষার অবসর খুঁজিতেছিলেন। ছাপরায় তাঁহার সে অবসর জুটিল—সঙ্গীত-চর্চ্চার সুযোগ ঘটিল। এই সঙ্গীত-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীত-রচনা-শক্তিরও উন্মেষ দেখা দেয়।—সে সব কথা আগামী বারে আমরা বিবৃত করিব।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়।

# বিচারক !

( কথা-চিত্র )

১

আমি বিচারক ! আশ্চর্য্য ! কে কার বিচার করে ! ঝড় কেন হয়, বাজ কেন পড়ে, ভূমিকম্পে নগর কেন ধ্বংস হয় ? এর উত্তর কে দিবে ?...কার দণ্ড, কার বিচারে এ হয় ? আমিও বিচারক ! কিসের ?—সমাজ-বৃক্ষ হইতে একটা পাতা কেন এমন করিয়া ঝরিয়া গেল, তারি বিচারক ! আশ্চর্য্য ! ঝড়ের পাতার বিচারক ! আশ্চর্য্য...আমি ! বড় ঝড়ে গাছ উপড়ায়, সাগর তোলপাড় করে, সব উড়াইয়া দেয়। সে কার ঝড় ! সে ঝড় তুলে কে ? আর আমার রচা যে ঝড় ; সে ঝড়ে উড়িল একটা পাতা। বড় ঝড়ে পৃথিবী ওলট-পালট হইয়া গেল...আমার ঝড়ে একটা পাতা উড়য়া গেল। হো ! হো ! আমিই ঝড়, আমিই বিচারক ! সে কে ?...যে এই ঝড় তুলে...সেও কোথায় বড় ঝড়ের স্রষ্টা, সেও তবে কিসের বিচারক। যে অক্ষমতা, আমার মধ্যে, সে অক্ষমতাও তবে সেই তার মধ্যে...অক্ষমতা...অক্ষমতা...উভয়েরই তবে জাত এক ! তবে বিচার করে কে ? তার বিচার সে করে, আমার বিচার আমি করি। রাজধর্ম্মের কাছে, আমার ঝড়ের বিচারও আমার প্রাপ্য—অবশ্য প্রাপ্য। আমি আমার মনুষ্যত্বের দ্বারে, মানুষের...তার অন্তঃপুরে এই ঝড় তোলার বিচারের যথাযথ শাস্তি পাইবার, আমার নিঃসঙ্কোচ দাবী আছে। রাজধর্ম্মের কাছে সেই বিচারের দাবী করি ! নইলে আমাকে মানুষের ধাপ হইতে খারিজ করিতে হয়। আমি মানুষ, সে অধিকার—শাস্তি লইবার অধিকার রাজার কাছে আমার বিশিষ্ট প্রাপ্য। হরি ! হরি ! কিন্তু

বিচারক যে আমিই! ভাবিয়োনা যে ইহা সমস্যা বা প্রহেলিকা—ইহাই সত্য!

পদতলে রতি কাম করে আত্মদান
ছিন্নমস্তা নিজ রক্ত নিজে করে পান...

নিজ মুণ্ড কাটিয়া নিজ হাতে ধরিয়া তার সেই তপ্ত রক্তের ফিন্‌কি পান করিতেছি। ঝড় যখন তুলিয়াছি, রুদ্র দণ্ড নিজের বিচারে নিজেই লইব।

২

পাপ করিলাম আমি, চাপ পড়িল অন্যের উপর। অভিযোগ উঠিল, যে পাতা তাহার উপর; যে পাপের স্রষ্টা তাহার উপর নয়; যে পাতা, সমাজ তাহার উপর খড়্গ লইয়া শাস্তা-রূপে আসিল—সমাজের কর্ণধার রাজা···রাজধর্ম্ম তাহাকে অন্ধ কারাগারে বন্ধ করিল। সমাজের ক্রিয়া চলিল! সৃষ্টি করিলাম আমি অলক্ষ্যে, প্রত্যক্ষে ভোগ করিল অন্যে, জ্বালা বাড়িল সমাজের। কেননা তার যে অপরোক্ষ অনুভূতি। সমাজের কর্ত্তাও ত আমি! আমি যে বিচারক! হারে দুনিয়া! হারে মানুষ! বড় স্রষ্টার বিচারে ক্ষমতা. অক্ষমতার দাবী আছে, ক্ষমা আছে, নাই তোমার। তাই হয়...সূর্য্যের তাপ সহা যায়, পদতলের বালুর তাপ সহা যায় না।...

৩

অভিযোগ, কাজলা বলিয়া একটি মেয়ে তার শিশু পুত্রকে হত্যা করিয়া পতিতোদ্ধারিণীর স্রোতজলে তাহাকে ভাসাইয়া দিতে গিয়াছিল। ঝঞ্ঝনায় ঝাঙ্কৃত প্রকৃতি যখন উন্মাদ নর্ত্তনে ঝড় তুলিয়া তিমিরের খেলা খেলিতেছিল, তখন কাজলা নিঃশব্দে জলে নামিতেছিল, অদূরে শ্মশান...ধারার বর্ষণে ঝঞ্ঝার দাপটে চিতা নিভিয়া গেছে, অর্দ্ধদগ্ধ শবদেহ বিকৃত রূপের নেশায় ভোর হইয়া সহরের গ্যাসের আলোয় হাহা করিয়া হাসিতেছিল। সমাজের

বাহুবল পুরুষ, বলের দ্বারা স্ত্রীলোকের গতিরোধ করিল, পতিতো-দ্ধারিণী পতিতাকে আর বুকে ধরিতে পারিলেন না। শূন্য আস্ফালনে ঝড়ের নৃত্যের সঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া তটে আছড়াইয়া, গর্জ্জিয়া, কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিলেন। মাতার ক্রন্দন বড় বিচারকের কাণে বুঝি পৌঁছায় না। কাজলা আঁধার আকাশের তলে...তার অন্ধকার প্রাণটা, অন্ধকারে মিশাইতে পারিল না। সমাজ বলিল রাক্ষসী, পুরুষে বলিল, 'শাস্তি দাও,' ঘরের মেয়েরা বলিল, 'আহা', রাজা বলিলেন, 'বেড়ী দাও', বাহিরের মেয়েরা বলিল···'প্রাণ ত গেছেই, দেহের কারবার কর'...পদতলে সর্ব্বসহা কাঁপিয়া উঠিল, আকাশ বাতাস গর্জ্জিয়া বলিল 'মুক্তি দাও!'...দুনিয়াটার বিচারের নেশা লাগিয়া গেল।

৪

সর্ব্বনাশ! সৃষ্টিকে নষ্ট করিতে চায় এত বড় অভিযোগ! এত বড় অন্যায়...সমাজধর্ম্মের রক্ষক রাজা বলিলেন, 'বিচার কর, বিচার কর, সে যেন সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলে না, যেন নির্দ্দোষী না দণ্ড পায়, দণ্ড নেতৃত্ব ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত চাই! বিচার কর!' ...আসিল ন্যায়। সোজা কথা যা সহজ হইয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতে-ছিল, তাহাকে বাক্‌জালের মধ্যে ফেলিয়া, কার্য্য-কারণের সম্পর্ক আনিয়া, ইতিহাসের পাতার মসীলেখায় চক্ষু উজ্জ্বল করিয়া, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইল। নরনারী তাহার স্বাভাবিক স্ফুর্ত্তি, তার স্বাভাবিক ক্ষুধার আগ্রহে মিলিত হইয়া নূতন জগতে যে সৃষ্টির ভিতর নিজেরা ফুটিতেছিল...পরস্পরের আত্মদানের মাঝে যে পূর্ণতা ভরিয়া উঠিতে-ছিল; তাহাকে সংযমের দণ্ড আনিয়া ন্যায় গড়িল, স্বভাবকে বাঁয়ে রাখিয়া, গলা টিপিয়া। পুরুষের গড়া শাস্ত্র চীৎকার করিয়া উঠিল, 'শাসন কর! শাসন কর! ইহা ব্যভিচার!'...ইতিহাসে এমনি হয়!

৫

এখন এর ইতিহাস কি? কাজলা কায়েতের মেয়ে। বাপ ছিল না। পাঁচ বছরের সময় বাপ গিয়াছিল, নয় বছরের সময় মা গিয়াছিল, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় পাইল। ছেলে কোলে করিত। বাসন মাজিত, ভাত পাইত, মা বাপের জন্য লুকাইয়া কাঁদিত। রাত্রে বুড়া ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া, বামুনমার কাছে ঘুমাইত। সাত বৎসর এমনি কাটে। সাত বৎসর বসন্ত ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া ধরাকে জাগাইতেছিল। কাজলাকেও রূপের ঝলকে আলা করিয়া দিল। রূপ ছাপা যায় না আঁচল ছাপিতে চায়...তার চোখের চাহনিতে চাহনিতে আগুন ঠিক্‌রিতে লাগিল... নিঃশ্বাসে মলয়, কণ্ঠস্বরে মাদকতা...দিন গেল...ফুল ফলে পরিণত হয়! স্বভাব ফলের আকাঙ্ক্ষায় যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তার রূপ, তার গন্ধ, তার স্পর্শ জাগিয়া উঠিল, ও স্পর্শ পরশের জন্য ব্যাকুল। শিকারী পুরুষ তাহাকে শিকারের খেলায় খেলিতে চাহিল। শিকার যে পুরুষের ব্যবসা। ব্রাহ্মণের এক পুত্র ছিল। পুত্র তীর ধনু লইয়া ব্যাধের মত ধায়, কাজলা তার কাল কাজলের রেখাটানা হরিণচোখ তুলিয়া শিহরিয়া ছুটিয়া বন্য মৃগের মত পলাইয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণের বাড়ী মৃগারণ্য, ব্যাধের পালায় ব্রাহ্মণের পুত্র...মৃগের পালায় কাজলা...কায়েতের মেয়ে, মেয়ে মানুষের স্বভাব ধর্ম্মে ছেঁড়া আঁচল জড়াইয়া জড়াইয়া, নুইয়া দেহ-লতাকে দুমড়াইয়া লতার মত লতাইয়া সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। একদিন লতা পায়ে বাধিয়া অনবধান মৃগ পড়িয়া গেল। অবসর বুঝিয়া শিকারী তীর হানিল। মৃগ বিদ্ধ হইল। বানাহত মৃগী সজল নয়ানে শিকারীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল। সমাজ বলিল মৃগমাংস অতি সুস্বাদু ভক্ষণ কর।... ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে কাজলা বিতাড়িত হইল। তখন মৃগী তাহার দোহদা ব্যথায় কাঁপিতেছে। সর্ব্বসহা সকলি সয়। নইলে পালন করে কে।...এই হইল তার কার্য্য-কারণের বন্ধনীর ধারা।...

রক্ষণশীল সমাজ এক অরক্ষণীয়া কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ পুত্রের খুব ঘটা করিয়া বিবাহ দিল। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' এর একটুও অভাব হইল না।

৬

বাকী ইতিহাস; তাহার ফল, সমাজশাস্ত্রে কাজলার কর্ম্মফল... ভদ্র গৃহে আর স্থান নাই, সমাজ বড় দার্শনিক পণ্ডিত। নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প। চিত্তে তাহার বিকার নাই। যম নিয়মের দ্বারা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই যে তাহার ধর্ম্ম। সমাজ তাহাকে আশ্রয় দিল না। মাতা আশ্রয় পাইল না। মায়ের সন্তান মাকে জায়গা দিল না... একটা কুঁড়ে মিলিল, গতর খাটাইয়া ভাতও জুটিল, বক্ষের দুগ্ধ-সুধা সন্তান পাইল। দিন গেল, বৎসর গেল...ছাত্রাবাসে চাকরাণী—শিশু পুত্র, কাঁদে, কাঁদে...ঘুমাইয়া পড়ে—মাটির মেজেয় পড়িয়া থাকে। আবার এখানেও সেই মৃগ ব্যাধের পালা, নূতন শিকারীর অভাব নাই। কাজলার চোখের চারিদিকে কালি বেশী করিয়া পড়িল। কিন্তু না হইলে যে সন্তান বাঁচে না...স্রষ্টা ত সৃষ্টি করিয়াই খালাস. এখন মাতা নাড়ী ছিঁড়িয়াছে, সে যে পাতা, পালন করিতেই হইবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নৈয়ায়িকের স্বধর্ম্ম পুণ্ডরীক...ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল...কিন্তু মাতা সন্তানকে ফেলিতে পারিল না। দিন গেল, সন্তানকে কবিরাজের রাজত্বে আসিতে হইল। কাজলার ছাত্রাবাসের কায বন্ধ হইল। তাহার বুকের ধন বুকে করিয়া...বুকে করিয়া ঘুমপাড়ানীর গান গাহিতে লাগিল—

ঘুমের মাসী ঘুমের পিসী
ঘুম দিলে ভালবাসি
ঘুমনা লো তরুলতা
ঘুমনা লো গাছের পাতা,
তুই ঘুমুলে জুড়োয় ব্যথা,
বল্‌না সে ঘুম পাই লো কোথা...

ঘুমের বুড়ী নয়ন-ঢুলানি নয়নে চামর ঢুলাইয়া দিল। এমন ঘুম আসিল সে ঘুম আর ভাঙিল না। কাজলা বুকে বুকে কুঁড়ের দাওয়ায় বুকের ধনকে চাপিয়া উদাস আঁখি বেড়াইতেছিল...বাহিরে "ঝঞ্ঝা গরজন্তি"...দিক কাল আঁধারে ডুবিয়া গেল...অন্ধকারে সেই নূতন শিকারীর চক্ষু তাকে বিদ্ধ করিবার জন্য ছাত্রাবাস হইতে এখানেও' তাড়া করিল। কাজলা পালাইতে চায়, পালাইবার পথ নাই। বুকে মৃত শিশু—মন নিশ্চিন্ত আজ কয়দিনের পর যে তার বাছা ঘুমাইয়াছে। সন্ধ্যা...লক্ষ্মীপূজার সন্ধ্যা—ঘরে সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই। বাড়ীওয়ালী বলিল, 'ওমা আজ নখ্যিবার, সন্দ্যে পর্য্যন্ত দেওয়া নেই'...কাজলার ছেলে বুকে, সে যে নামাইতে পারে না...তারপর ...বাড়ীওয়ালী টাকার লোভ দেখাইল...কত ভাল কথা বুঝাইল। শিকারী এবার এ রূপের বদলে অখণ্ড মণ্ডলাকারের যাদুমন্ত্রে চরাচরের নূতন শিকার খেলিতে চাহিল...পারিল না—তাড়া করিল...ভয়ে, দুঃখে, লজ্জায়, কাজলা কাঁপিয়া উঠিল। বাড়ীওয়ালী বলিল, 'বের আমার বাড়ী থেকে'...কাজলা চমকিয়া উঠিল। বাহিরে বৃষ্টি ঝড়। কাজলা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত। বাড়ীওয়ালী ছেলেকে নাড়িয়া দেখিল, সেটা খাঁচা ফেলিয়া উড়িয়া গেছে। ঘুমের বুড়ী জুজুবুড়ীর মত আসিয়া কখন তাহাকে লইয়া গেছে। বলিল...'রাম! রাম! এই ভর সন্ধ্যে বেলা অজেতের মড়া ছুঁয়ে মলুম, মা—মা—মা...কি আপদ গা...তুমি বাপু পথ দেখ'...কাজলা বিতাড়িত হইল। শিকারী কিন্তু পিছনে। এ সমাজে নারী ধরা যে পুরুষের দায়াধিকার। ঝড়ের পাতা উড়িয়া গেল। শিকারী কি এত যুগের শিকার ব্যবসা রদ করিতে পারে?

৭

অদূরে গঙ্গা। এইখানে সবাই আসে, গঙ্গায় ত মড়া এলে না... চারিদিকে মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। বিদ্যুতের কষাঘাতে থাকিয়া থাকিয়া আকাশ দীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। কাজলা গঙ্গায় নামিল। শিকারী

ধরিল। সমাজ পুরুষের গড়া। শিকারীর সমাজ। সর্ব্বভুক কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ চীৎকার করিয়া উঠিল...মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরের যত শর ছিল একে একে যোজনা করিল...কাজলা হরিণ জালে পড়িল। সমাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হইল, বক্ষে সেই মৃত শিশু। বিশীর্ণদেহা কোটরগত চক্ষু। আঁখির পলক পড়ে না, নাসার নিশ্বাসও বুঝি থামিয়া যায়। এই ইতিহাসের আর এক পৃষ্ঠা!!! সমাজ বুলি ধরিল, ঝড়ের পাতা কুড়াইয়া শাসন কর! শাসন কর। ধর্ম্ম যে যায়!

৮

তারপর বিচার!!! বিচার! ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চাই! দণ্ড নেতৃত্ব আমারই হাতে। কেন্দ্রীভূত রাজধর্ম্মে—আমিই বিচারক! "কাজলা! কাজলা! আমার কাজল!" বহুদিনের হারাণ সুর ঝঙ্কৃত হইয়া ধ্বনিত বিধূনিত হইয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিল!...হো! হো! বিশ্বরাজ! রাজধর্ম্ম পালন কর, আমিই সেই ব্রাহ্মণ পুত্র! আজ তবে আমার বিচারক কে?...

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

———

## সরিষার ফুল

( ১ )

চিরদিন, চিরদিন, আমি তোরে করিয়াছি ঘৃণা,
লো লাঞ্ছিতা, চরণ-দলিতা!
বুঝি নাই—রূপ-রাজ্যে কেহ নাই অতি দীনা হীনা,—
সকলেই ধনীর দুহিতা!
হৃদয়-নিকষে মোর, কভু তোর করিনি পরখ,—
কাঞ্চনেও ভেবেছি পিত্তল!
প্রেমিক জহুরি নহি—কি বুঝিব হীরক্-ঝলক,
ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মুকুতার লাবণ্য তরল?

( ২ )

চিরদিন গোলাপেরে তুষিয়াছি গোলাপী সম্ভাষে!
কমলিনী সর-সোহাগিনী—
বীণার ঝঙ্কারে মোর, মেলি আঁখি, বিজয়-উল্লাসে,
হইয়াছে আরো গরবিণী!
প্রকৃতির একি ঘোর প্রতিশোধ! লো ফুল শোভন,
তুই ছিলি চির আঁখি-শূল—
তাই এবে গোলাপের, কমলের নাহি দরশন!
চারিধারে একি হেরি? চারিধারে সরিষার ফুল!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

# মগধের মৌখরি-রাজবংশ

[ যশোহর সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত ]

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের সমকালে উত্তরাপথের রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুত্থানের সহায় হইয়াছিল। এই সকল রাজবংশের মধ্যে মগধের মুখরবংশীয় বর্ম্মরাজবংশ সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে।(১) দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের রাজত্বকালে ইঁহাদিগের প্রকৃত অভ্যুত্থান হইলেও প্রথম গুপ্তরাজবংশের অবসানযুগেও মগধরাষ্ট্রের কিয়দংশে বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থান সূচিত হইয়াছিল। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরিবর্ম্মা। হরিবর্ম্মার পুত্র আদিত্যবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা। ইঁহারা বর্ম্মবংশের লেখমালায় 'মহারাজ'-উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ঈশ্বরবর্ম্মার পুত্র ঈশানবর্ম্মাই সর্ব্বপ্রথম 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। হরি-বর্ম্মা প্রভৃতি প্রথম তিনজনের পত্নী 'ভট্টারিকাদেবী' উপনামে বিভূষিতা, কিন্তু ঈশানবর্ম্মার পত্নীর নামের সহিত 'ভট্টারিকামহাদেবী' এই অধিকতর সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।(২) ঈশানবর্ম্মার পূর্ব্ব-পুরুষগণের কোনও মুদ্রা এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল বিষয় হইতে অনুমান হয়, তাঁহারা তাদৃশ ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ঈশানবর্ম্মাই মৌখরিবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলিয়া বিবেচনা হয়।(৩)

---

(১) V. A. Smith's Early History of India, Third Edition, P. 312.

(২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, III, P. 220.

(৩) A Historical sketch of the Central Provinces and Berar, by V. Natesa Aiyar B. A., P. 12.

জৌনপুরে হরিবর্ম্মদেবের পৌত্র ঈশ্বরবর্ম্মার এক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।(৪) ইহাতে অন্ধ্রগণের প্রসঙ্গে একজন নৃপতির নাম ছিল,(৫) কিন্তু শিলালিপির উক্ত অংশ লুপ্তপ্রায় হওয়ায় এতৎপ্রসঙ্গে কি বলা হইয়াছে স্থির করা যায় না। অন্ধ্রগণের সহিত মৌখরিগণের নিশ্চয়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ঈশ্বরবর্ম্মার পুত্র ঈশানবর্ম্মা অন্ধ্রাধিপতিকে পরাজিত করেন বলিয়া একখানি শিলালেখে উক্ত হইয়াছে। (৬)

গুপ্তরাজবংশের সহিত ঈশানবর্ম্মার পিতামহ আদিত্যবর্ম্মার সদ্ভাব ছিল, তিনি দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের হর্ষগুপ্তের ভগিনী হর্ষগুপ্তাকে বিবাহ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন।(৭) ঈশানবর্ম্মার সময় মৌখরিগণের সহিত গুপ্তরাজবংশের সখ্যসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল। তিনি গুপ্তরাজবংশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বাধা দিয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ হূণগণ আসিয়া যখন উত্তরাপথের সিংহদ্বারে আঘাত করিল, তখন এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ আপনাদের পুরাতন বৈরিভাব বিস্মৃত হইয়া হূণশক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন। আদিত্যসেনের অফসড়লিপিতে মৌখরিগণকে হূণ-বিজয়ী বলা হইয়াছে।(৮) এ প্রশংসা মৌখরিগণের শত্রুপক্ষ করিতেছেন, সুতরাং ইহা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। বোধ হয় হূণগণ পরাজিত হইলে মৌখরি ও গুপ্তবংশের পুরাতন বৈরিভাব পুনরায় প্রভাববান্ হইয়াছিল। অফসড়লিপি হইতে জানা যায়, কুমারগুপ্তকর্ত্তৃক ঈশান-

---

(৪) Fleet's Gupta Inscriptions, Pp. 228—30.

(৫) Ibid. Pp. 229—30.

(৬) Annual Report of the Lucknow Provincial Museum for the year ending 31st. March, 1915, P. 3.

(৭) Fleet's Gupta Inscriptions, P. 220; Bana's Harsacarita, Translated by Cowell & Thomas, P. XI, note 3.

(৮) Fleet's Gupta Inscriptions, P. 203.

বর্ম্মা পরাজিত হন।(৯) বার্ণ্ বলেন, ইনি দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত।(১০) কিন্তু ইহা সত্য নহে। প্রথম জীবিতগুপ্তের তনয় তৃতীয় কুমার-গুপ্তই ঈশানবর্ম্মাকে পরাজিত করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুমার-গুপ্তের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র দামোদরগুপ্ত মগধের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন।(১১) কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ মৌখরিগণ (ঈশানবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিনায়কতায়) দ্বিতীয়বার মস্তক উত্তোলন করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা দামোদরগুপ্তের হস্তে পুনরায় নির্জ্জিত হন।(১২) অফসড়লিপিতে ঈশানবর্ম্মার রাজত্বপদসূচক কোনও উপাধি নাই; সম্ভবতঃ গুপ্তগণ মুখরনৃপতিগণকে যথার্থ অধি-কারী বলিয়া গণনা করিতেন না। ঈশানবর্ম্মার নামাঙ্কিত কতিপয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কানিংহাম সর্ব্বপ্রথম 'ঈশানবর্ম্মা'র স্থলে 'শান্তিবর্ম্মা' পাঠ করিয়া ভ্রমে পতিত হন।(১৩) পরে ফ্লিট এবং ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ 'ঈশানবর্ম্মা' এই প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করেন।(১৪) ঈশান-বর্ম্মার মুদ্রায় তারিখ দেওয়া আছে। ফ্লিট্ দুইটি মুদ্রা পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, তারিখের অঙ্কগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট, উহা পাঠ করা যায় না।(১৫) ফৈজাবাদ জেলায় ঈশানবর্ম্মার নয়টি মুদ্রা আবি-ষ্কৃত হইয়াছে। বার্ণ্ উক্ত মুদ্রাসকল পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়া-ছেন, ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত হয়।(১৬) সম্প্রতি যুক্তপ্রদেশে,

---

(৯) Ibid.

(১০) J. R. A. S. 1906, Pp. 849, 850.

(১১) Gupta Inscriptions, P. 203. (১২) Ibid.

(১৩) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Vol. IX, Pp. 27—28.

(১৪) Indian Antiquary, Vol. XIV, P. 68; J. R. A. S. 1819, Pp. 136—7.

(১৫) I. A. Vol. XIV, P. 68. (১৬) J. R. A. S. 1906, P. 849.

বারাবাঁকী জেলার অন্তর্গত হার্হানামক স্থানে ঈশানবর্ম্মার রাজ্য-কালের একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।(১৭) লক্ষ্ণৌচিত্রশালা হইতে উহার প্রতিলিপি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রেরিত হয়। বিগত পৌষমাসে কলিকাতা চিত্রশালায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উক্ত প্রতিলিপি দেখিতে পাই। সম্প্রতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিরামচন্দ্র দিবেকর এম, এ, মহাশয় এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত 'সরস্বতী'নামক হিন্দী পত্রিকায় হার্হালিপির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।(১৮) ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্য-বর্ম্মা মৃগয়া করিতে যাইয়া বনমধ্যে এক ভগ্ন শিবালয় দেখিতে পান। হার্হায় আবিষ্কৃত শিলালিপিতে উহার জীর্ণোদ্ধারের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হার্হালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি, ঈশান বর্ম্মার এক পুত্রের নাম সূর্য্যবর্ম্মা ছিল। যথা :—

যস্মিন্ শাসতি চ ক্ষিতিং ক্ষিতিপতৌ জাতেব ভূয়স্ত্রয়ো।
তেন ধ্বস্তকলিপ্রবৃত্তিতিমিরঃ শ্রীসূর্য্যবর্ম্মাজনি ॥

—১৬শ শ্লোক

আশিরগড়ে প্রাপ্ত এক মোহর হইতে ঈশানবর্ম্মার আর এক পুত্র শর্ব্ববর্ম্মার নাম পাওয়া যায়।(১৯) সুতরাং ঈশানবর্ম্মার দুই পুত্র ছিল—শর্ব্ববর্ম্মা ও সূর্য্যবর্ম্মা। হার্হালিপির তক্ষণকাল ৬১১ অথবা ৫৮৯ বিক্রমাব্দ, অর্থাৎ ৫৫৪-৫৫ অথবা ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ।(২০) সে সময় ঈশানবর্ম্মা বর্ত্তমান ছিলেন।

---

(১৭) Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, 1915, P. 3.

(১৮) সরস্বতী—মাঘ, ১৩২২—'সূর্য্যবর্ম্মা কা শিলালেখ,' পৃঃ ৮০—৮৬।

(১৯) Gupta Inscriptions, P. 221.

(২০) Annual Report of the Lucknow Provincial Museum, 1915, P. 3, Note.

একাদশাতিরিক্তেষু ষট্সু শাতিতবিদ্বিষি।
শতেষু শরদাং পত্যৌ ভুবঃ শ্রীশানবর্ম্মণি॥
[ ২০শ পঙ্ক্তি ]

ফৈজাবাদ জেলায় শর্ব্ববর্ম্মার ছয়টি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, উহার দুইএকটি ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।(২১) তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং হার্হালিপি সম্ভবতঃ ৫৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয় নাই, বস্তুতঃ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দেই হইয়াছিল। হার্হালিপি হইতে ঈশানবর্ম্মার রাজত্বকালসম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য অবগত হওয়া যায়। ঈশানবর্ম্মা ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই তিনি অন্ধ্রাধিপতিকে এবং গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করিয়াছেন।

জিত্বান্ধ্রাধিপতিং সহস্রগণিতত্রিধাক্ষরদ্বারণম্
ব্যাবল্গন্নিযুতানি সংখ্যে তুরগানভঙ্ক্ত্বা রণে [ মূ ] লিকাম্।
কৃত্বা চায়তিমোচিতস্থলভুবো গৌড়ান্ সমুদ্রাশ্রয়ে
নধ্যাসিষ্ট নতক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনং যো জিতো॥
—১৩শ শ্লোক

মৌখরিগণ কর্ত্তৃক গৌড়বিজয় বাঙ্গালার ইতিহাসে এক সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার বলিয়া কথিত হইতে পারে। কিন্তু তখন গৌড়াধিপতি কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর প্রারম্ভে কোন্ রাজবংশ গৌড়ের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন নূতন আবিষ্কার না হইলে তাহা বলিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ ৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ঈশানবর্ম্মার মৃত্যু

(২১) J. R. A. S., 1906, P. 849.

হয়। ঈশানবর্ম্মার মৃত্যুর পর তৎপুত্র শর্ব্ববর্ম্মা রাজা হন। তিনি বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত বরুণিকাগ্রাম অর্পণ করেন, একথা উক্তগ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের খোদিত লিপি হইতে জানা যায়।(২২) পঞ্চনদের অন্তর্গত নির্ম্মন্দগ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজ সমুদ্রসেনের তাম্রশাসনে শর্ব্ববর্ম্মার উল্লেখ আছে।(২৩) শর্ব্ববর্ম্মা কপালেশ্বর নামক দেবতার জন্য উক্ত গ্রামে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বুরহান্‌পুরের নিকটবর্ত্তী আশিরগড়ে শর্ব্ববর্ম্মার এক তাম্রমোহর আবিষ্কৃত হয়।(২৪) উহাতে তাঁহার বংশতালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। ফ্লিট বলেন, আশিরগড়ে মৌখরিবংশের মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ অঞ্চল মৌখরিগণের অধিকারভুক্ত ছিল এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে।(২৫) ফৈজাবাদে আবিষ্কৃত শর্ব্ববর্ম্মার মুদ্রার শেষ তারিখ ৫৫৭ খৃষ্টাব্দ।(২৬) কোন্ সময় শর্ব্ববর্ম্মার মৃত্যু হয় তাহা জানা যায় না। শর্ব্ববর্ম্মার ভ্রাতা সূর্য্যবর্ম্মা কতদিন জীবিত ছিলেন তাহাও অবগত হইবার উপায় নাই। সিরপুরে প্রাপ্ত কটকের সোমবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ প্রথম মহাশিবগুপ্তের একখানি শিলালিপিতে (২৭) মগধের বর্ম্মবংশীয় এক সূর্য্যবর্ম্মার উল্লেখ আছে।(২৮) মহাশিবগুপ্তের পিতা হর্ষগুপ্ত সূর্য্যবর্ম্মার কন্যা বাসটাদেবীকে বিবাহ করেন। সিরপুরলিপির আলোচ্যস্থল এইরূপ :—

> নিষ্পঙ্কে মগধাধিপত্যমহতাং জাতঃ কুলে
> বর্ম্মণাং পুণ্যাভিঃ কৃতিভিঃ কৃতী কৃতমনঃকম্পঃ সুধাভোজিনাম্।

---

(২২) Fleet's Gupta Inscriptions. P. 216. (২৩) Ibid. Pp. 289—90.

(২৪) Ibid. Pp. 219—21. (২৫) Ibid. P. 220.

(২৬) J. R. A. S. 1906, P. 849.

(২৭) Epigraphia Indica. Vol xi, Pp. 184—201.

(২৮) Ibid. P. 191.

বামামাক্ত সুতাং হিমাচল ইব শ্রীসূর্য্যবর্ম্মা নৃপঃ
প্রাপ প্রাক্‌পরমেশ্বরশ্বশুরতাগর্ব্বানিখর্ব্বং পদম্ ॥
—১৬শ শ্লোক

উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ এইরূপ—যে বর্ম্মগণ মগধদেশে আধিপত্যহেতু বরেণ্য বলিয়া পরিগণিত হন সেই নিষ্কলঙ্ক [ 'নিষ্পঙ্কে' ] বর্ম্মবংশে সূর্য্যবর্ম্মা নামক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আচরিত সদনুষ্ঠান দেবগণের [ 'সুধাভোজিনাম্' ] হৃদয়েও কম্পন উপস্থিত করিয়াছিল। সূর্য্যবর্ম্মা পূর্ব্বদেশাধিপতিকে [ 'প্রাক্‌পরমেশ্বর' ] কন্যাদান করিয়া হিমাচলের ন্যায় গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলেন।

সিরপুরলিপি তারিখযুক্ত নহে। উক্ত লিপির প্রকাশক রায়-বাহাদুর হীরালাল মত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।(২৯) মহাশিবগুপ্তের রাজ্যকালের আর একখানি শিলালিপির তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর কীলহর্ণও ঐ কথাই বলেন।(৩০) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রায়পুর জেলার 'গেজেটিয়রে'ও মহাশিবগুপ্তের খোদিত লিপিনিচয় খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।(৩১) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নটেশ আয়ার মহাশয় রায়পুরচিত্রশালার পুরাবস্তুসমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে (৩২) তিনি মহাশিবগুপ্তের দুইখানি শিলালিপিকে খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আলোচ্য সিরপুরলিপি উহাদিগের অন্যতম।

---

(২৯) Epigraphia Indica, Vol. XI, P. 184.

(৩০) Indian Antiquary, Vol. XVIII, P. 179.

(৩১) Raipur District Gazetteer, Edited by A. E. Nelson, Vol. A, P. 67.

(৩২) A Descriptive List of the Antiquities in the Raipur Museum, P. 6.

রায়বাহাদুর হীরালালের মত গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি [ 'প্রতিভা' নামক মাসিক পত্রিকায় ] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী ইতিহাসাধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, "শিলালিপিখানি মহাশিবগুপ্তের রাজ্যকালে খোদিত হইয়াছিল ; ইহাতে কোন তারিখ নাই, কিন্তু অক্ষরতত্ত্বহিসাবে ইহাকে অষ্টম বা নবম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যবর্ম্মা মহাশিবগুপ্তের মাতামহ। এই শিলালিপি মহাশিবগুপ্তের রাজ্যলাভের কিছুকাল পরে লিখিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে ; কারণ ইহাতে মহাশিবগুপ্তের বহু যুদ্ধজয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং সূর্য্যবর্ম্মা ৭ম শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।" [ প্রতিভা, ভাদ্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭১ ]। রমেশবাবুর এবং তিনি যাঁহার অনুসরণ করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই রায় বাহাদুর হীরালালের উল্লিখিত অক্ষরতত্ত্বের 'হিসাব' কতদূর ঠিক দেখাইতে চেষ্টা করিব।

সিরপুরলিপির অক্ষরগুলি যিনিই লক্ষ্য করিবেন তিনিই অচিরে বুঝিতে পারিবেন, উক্ত লিপির ১ম পঙ্‌ক্তি হইতে ১৪শ পঙ্‌ক্তির 'সনাতনম্‌' পর্য্যন্ত এক হাতের লেখা এবং অবশিষ্টাংশ আর এক হাতের লেখা। খোদিত লিপির এই দুই অংশের 'শ'গুলির পরস্পর তুলনা করিলে ইহাও প্রতিপন্ন হইবে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রথমাংশ প্রথমে এবং শেষাংশ শেষে উৎকীর্ণ হয়। মহানামনের বুদ্ধগয়ালিপি (৩৩) ৫৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে এবং মহারাজ আদিত্যসেনের অফসড়লিপি (৩৪) অনুমান ৬৭২ খৃষ্টাব্দে খোদিত হয়। নবাবিষ্কৃত হার্হালিপির তারিখ ৫৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ। এই তিনখানি শিলালেখের অক্ষরের সহিত সিরপুরলিপির অক্ষর

(৩৩) Gupta Inscriptions, P. 274—78.
(৩৪) Ibid. Pp. 200-8.

মিলাইলে শেষোক্ত লিপির কাল নির্ণীত হইতে পারে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া উত্তরাপথে প্রচলিত অক্ষর-মালার মধ্যে 'শ' 'হ' ও 'ভ' এই তিনটি অক্ষর সর্ব্বাপেক্ষা রূপান্তরিত হইয়াছিল। উক্ত অক্ষরত্রয়ের সাহায্যে এই যুগের তারিখহীন লেখ-মালার কাল নিরূপিত হইয়া থাকে। হার্হালিপির এবং বোধগয়া-লিপির 'শ', 'হ' ও 'ভ' সিরপুরলিপির 'শ', 'হ' ও 'ভ' হইতে প্রাচীন-তর। অফসড়লিপিতে যে প্রকারের 'শ' আছে সে প্রকারের 'শ' সিরপুরলিপির প্রথমাংশে [ ১ম হইতে ১৪শ পঙ্‌ক্তির 'সনাতনম্' পর্য্যন্ত ] দৃষ্ট হয় না, দ্বিতীয়াংশেই কেবল লক্ষিত হয়। অফসড়-লিপির 'শ' সিরপুরলিপির প্রথমাংশের 'শ' অপেক্ষা আধুনিক। কিন্তু এই দুইলিপির অন্যান্য অক্ষরগুলি এবং বিশেষতঃ 'হ' ও 'ভ' বিশেষ সদৃশ বলিয়া বিবেচনা হয়। সিরপুরলিপির প্রথমাংশ অফ-সড়লিপির পূর্ব্বে এবং মহানামনের বোধগয়ালিপির পরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ধারণা হয়। সিরপুরলিপির প্রথমাংশ খৃষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিলে অসমসাহসিকের কার্য্য হইবে। বস্তুতঃ উহাকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগের বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। সিরপুরলিপির প্রথমাংশেই [ ১১শ ও ১২শ পঙ্‌ক্তিতে ] সূর্য্যবর্ম্মার পরিচয় খোদিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাকে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ বা অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ না করিয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। সিরপুরলিপির তক্ষণকালে নিশ্চয়ই সূর্য্যবর্ম্মা বর্ত্তমান ছিলেন না, যেহেতু উহার রচয়িতা লিট্ বিভক্তিতে নিষ্পন্ন 'প্রাপ' পদের ব্যবহার করিয়াছেন। [ ১২শ পঙ্‌ক্তি ]

অতএব মৌখরি ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা এবং সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মা সমসাময়িক ইহা প্রতিপন্ন হইল। সিরপুরলিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, মহাশিবগুপ্তের মাতামহ সূর্য্যবর্ম্মা মগধের বর্ম্মকুলে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই বর্ম্মবংশীয় নরপতিগণ 'মগধাধিপত্য'হেতু গৌরবশালী

হইয়াছিলেন। মগধে দীর্ঘকাল ধরিয়া দুইটি বর্ম্মবংশ আধিপত্য করেন—পূর্ণবর্ম্মার বংশ এবং মৌখরি ঈশানবর্ম্মার বংশ। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং বলেন, পূর্ণবর্ম্মা মৌর্য্যরাজ অশোকের বংশধর।(৩৫) কিন্তু অশোকের বংশধরগণের মধ্যে এ পর্য্যন্ত সূর্য্যবর্ম্মা নামে কোনও নরপতির অস্তিত্ব জানা যায় নাই। সূর্য্যবর্ম্মাকে তদ্বংশজাত বলিবার কারণ নাই। সুতরাং বাকী থাকে এক মৌখরি বর্ম্মবংশ। এই বংশ যে খুব প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। পরলোকগত কানিংহাম সাহেব গয়ার সন্নিকটে পালিভাষায় "মোখলিনাম্"-উৎকীর্ণ এক মৃণ্ময় শিলমোহর প্রাপ্ত হন। উহার অক্ষর অশোকানুশাসনের অক্ষরের অনুরূপ। ফ্লিট্ বলেন, "মোখলিনাম্" পদের অর্থ—'মৌখরিদিগের।' (৩৬) এই সুপ্রাচীন মৌখরিবংশে ঈশানবর্ম্মার পুত্র এক সূর্য্যবর্ম্মারও নাম পাইতেছি। ইনি সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মার সমসাময়িক। অতএব সিরপুরলিপির সূর্য্যবর্ম্মাকে ঈশানবর্ম্মার পুত্র সূর্য্যবর্ম্মা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সিরপুরলিপিতে ব্যবহৃত "মগধাধিপত্য"-শব্দে রমেশবাবু সমগ্র মগধের আধিপত্য বুঝিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যবর্ম্মার বংশ অর্থাৎ মৌখরি-বর্ম্মগণ যে সমগ্র মগধের আধিপত্যলাভ করেন নাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মৌখরিগণের আধিপত্যকালে দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশের পতন হয় নাই, সুতরাং মগধের নায়কত্বপদপ্রাপ্তির সম্ভাবনা মৌখরি-গণের ছিল না। রমেশবাবুর ধারণা এই যে, মৌখরিগণের সহিত সূর্য্যবর্ম্মার সম্পর্ক ছিল না—তিনি স্বতন্ত্র বর্ম্মবংশোদ্ভব; খৃষ্টীয় সপ্তম-শতাব্দীর প্রারম্ভে মৌখরিগণের প্রভাব লুপ্ত হয়, এক নূতন বর্ম্ম-রাজবংশ খৃষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে সহসা প্রভাবশালী হইয়া উঠেন, এবং উত্তরাপথে গুপ্তবংশের পতনের পর তাঁহারাই সমগ্র

(৩৫) Watters, On Yuan Chwang, Vol. II, P. 115.

(৩৬) Fleet's Gupta Inscriptions, Introduction, P. 14.

মগধের অধীশ্বর হন।—কিন্তু ঈশানবর্ম্মার শিলালিপি আবিষ্কৃত হই-বার পর এখন উল্লিখিত অনুমান অসার বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। [ ঈশানবর্ম্মার শিলালিপি আবিষ্কারের পূর্ব্বেও ] সিরপুর-লিপির উদ্ধৃতাংশের ভ্রান্ত অর্থ কল্পনা করিয়া এবং রায়বাহাদুর হীরা লাল উহার কালসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সত্যাসত্যতা বিন্দু-মাত্র না পরীক্ষা করিয়া রমেশবাবুর ন্যায় ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিও এই উদ্ভট ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, 'মগধাধিপত্য'-শব্দে সমগ্র মগধের আধিপত্য যেরূপ বুঝায়, সামান্যতঃ মগধদেশের অংশমাত্রে আধিপত্যও বুঝাইতে পারে। সিরপুরলিপিতে সূর্য্যবর্ম্মার 'নৃপ'-পদবী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন্ সময় তিনি রাজা হন তাহা জানিবার উপায় নাই। সূর্য্যবর্ম্মার সময় মৌখরিবংশের পূর্ব্বগৌরব ব্যতীত্ আর কিছুই ছিল না। নগণ্যপ্রতাপ হর্ষগুপ্তের শ্বশুর হইয়া যিনি অতুল গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন তিনি মগধের রাষ্ট্র-নায়ক একথা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

মগধে মৌখরিবংশের আরও কয়েকটি শাখার পরিচয় পাওয়া যায়। দেওবরণার্কলিপিতে মৌখরি অবন্তিবর্ম্মার নাম আছে।(৩৭) শর্ব্ববর্ম্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বে যে বরুণিকাগ্রাম প্রদত্ত হয়, অবন্তিবর্ম্মকর্ত্তৃক সেই বরুণিকাগ্রাম পুনর্ব্বার বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ মনে করেন, তিনি হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী-পতি গ্রহবর্ম্মার পিতা অবন্তিবর্ম্মা।(৩৮) হর্ষচরিতে অবন্তিবর্ম্মা ও গ্রহবর্ম্মার উল্লেখ আছে।(৩৯) গ্রহবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের ভগিনী রাজ্যশ্রীর

---

(৩৭) Gupta Inscriptions, P. 216. (৩৮) Ibid. P. 215.

(৩৯) হর্ষচরিত, ৺জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক সম্পাদিত, পৃঃ ২৯৮, ৩০১, ৩১২, ৪২৪, ৪৭১, ৬৫৫।

পাণিগ্রহণ করেন।(৪০) মুদ্রারাক্ষসের কোনও কোনও পুথিতে চন্দ্রগুপ্তের পরিবর্ত্তে অবন্তিবর্ম্মার নাম আছে। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ইয়াকুভি ইঁহাকে কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মা বলিয়া মনে করেন, (৪১) কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গ বলেন, এই অবন্তিবর্ম্মা কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্ম্মা নহেন—মৌখরি অবন্তিবর্ম্মা।(৪২) অবন্তিবর্ম্মার সতেরটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা হইতে ৫৫৬, ৫৬৯ এবং ৫৭০ খৃষ্টাব্দ এই তিনটি তারিখ পাওয়া যায়।(৪৩) সম্ভবতঃ শর্ব্ববর্ম্মার রাজত্বকালেই তিনি মগধের কিয়দংশে আধিপত্য করিতেছিলেন। 'হর্ষচরিতে' কথিত আছে, জনৈক মালবনরপতি অবন্তিবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মাকে পরাজিত ও নিহত করেন।(৪৪) বুলরের মতে ইনি মালবরাজ দেবগুপ্ত।(৪৫) হর্ষচরিতে ক্ষত্রবর্ম্মা নামে একজন মৌখর-নরপতির উল্লেখ আছে।(৪৬) কথিত আছে, তিনি চারণদিগের গান শুনিতে ভালবাসিতেন। একদা তাঁহার শত্রুগণ ক্ষত্রবর্ম্মার নিকট একদল চারণ প্রেরণ করে, তাহারা 'জয়শব্দ' উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষত্রবর্ম্মাকে নিহত করিয়াছিল। ক্ষত্রবর্ম্মা কোন্ সময়ের রাজা বলা যায় না।

নেপালের লিচ্ছবিবংশের সহিত মৌখরিগণের সম্পর্ক ছিল। অংশুবর্ম্মার একখানি শিলালেখ হইতে জানা যায়, মৌখরি শূরসেন

---

(৪০) ঐ পৃঃ ২৯৮, ৩১২।

(৪১) V. A. Smith, Early History of India, Third Edition, P. 43, Note 1.

(৪২) Mudraraksasa, Bombay Sanskrit Series, Introduction, P. 21.

(৪৩) J. R. A. S. 1906, P. 849. (৪৪) হর্ষচরিত, পৃঃ ৪২৪।

(৪৫) Epigraphia Indica, Vol. I, Pp. 69—70. (৪৬) হর্ষচরিত, পৃঃ ৪৭৯.

অংশুবর্ম্মার ভগ্নী ভোগদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। শূরসেনের পুত্রের নাম ভোগবর্ম্মা এবং কন্যার নাম ভাগ্যদেবী।(৪৭) উক্ত শিলালিপি ৩৯ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়। লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৭৫৯ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে, দ্বিতীয় শিবদেব ভোগবর্ম্মার কন্যা বৎস-দেবীকে বিবাহ করেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের এক কন্যার সহিত ভোগবর্ম্মা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।(৪৮) শ্রদ্ধেয় রাখালবাবু তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" গ্রন্থে (৪৯) লিখিয়াছেন, গ্রহবর্ম্মা মৌখরিবংশের শেষ রাজা। কিন্তু ইহা গ্রহণ করা যায় না, যেহেতু মৌখরি ভোগবর্ম্মা সম্ভবতঃ গ্রহবর্ম্মার পরবর্ত্তী।

বরাবর ও নাগার্জ্জুনী গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ কতিপয় শিলালিপি (৫০) হইতে আর একটি বর্ম্মোপাধিধারী মৌখরিশাখার অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। যজ্ঞবর্ম্মা এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার পুত্রের নাম শার্দ্দূল-বর্ম্মা; শার্দ্দূলবর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মার রাজত্বকালে উল্লিখিত লেখমালা উৎকীর্ণ হয়। "বাঙ্গালার ইতিহাস"গ্রন্থে [ পৃঃ ১০০ ] রাখালবাবু মৌখরি বর্ম্মগণের বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন। উহাতে যজ্ঞবর্ম্মাকে ভ্রমক্রমে ঈশানবর্ম্মার পুত্র বলিয়া গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোনই প্রমাণ নাই। আশা করি, ভবিষ্যৎ-সংস্করণে উক্ত মারাত্মক ভুলটি সংশোধিত হইবে। ফ্লিট্ বলেন, হরিবর্ম্মার বংশব্যতীত মৌখরি-গণের অপরাপর শাখাসমূহ তাদৃশ প্রভাবশালী ছিল না।(৫১) হরিবর্ম্মার বংশের সহিত অন্যান্য মৌখরি শাখার কি সম্বন্ধ তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। আবিষ্কৃত-প্রমাণাবলীর সাহায্যে মৌখরিগণের

(৪৭) Indian Antiquary, Vol. IX, P. 171।

(৪৮) Ibid, P. 178. (৪৯) পৃঃ ৭৭

(৫০) Fleet, Pp. 221—23; 223—26; 226—28.

(৫১) Fleet, P. 15, Introduction.

নিম্নমুদ্রিত বংশলতিকা প্রদত্ত হইল :—
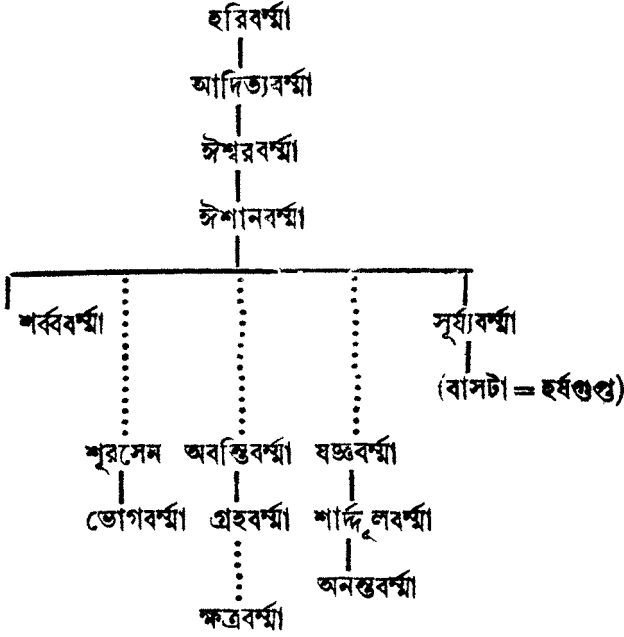
চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন চোয়াং লিখিয়াছেন, কুশস্থল অঞ্চলে গৌড়াধিপ শশাঙ্কের পূর্ণবর্ম্মা নামে মৌর্য্যবংশায় একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।(৫২) শ্রদ্ধেয় রমেশবাবু পরিব্রাজকের এ মত বিদিত থাকিয়াও পূর্ণবর্ম্মাকে মৌখরিবংশজাত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্য্য ও মৌখরি সমার্থক ভাবিয়াই তিনি এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অফসড়লিপিতে কথিত হইয়াছে, দামোদরগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করেন।(৫৩) ফ্লিট্, হর্ণলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন (৫৪) ইনিও মৌখরিবংশজাত, কিন্তু কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত নিধানপুর তাম্রশাসন হইতে জানা গিয়াছে, ইনি ভগদত্তবংশীয়।(৫৫)

(৫২) Watters, On Yuau Chwang, Vol. II, P. 115.
(৫৩) Fleet, P 203.
(৫৪) Fleet, P. 15; J. A. S. B., 1889, Part I, P. 102.
(৫৫) Epigraphia Indica, Vol. XII, P. 69,74.

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশীয় নৃপতিগণ কখনও মৌখরিগণকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহারা যে সময়ে সময়ে গুপ্তরাজগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মৌখরিগণের মুদ্রাসমূহই ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কোনও কোনও মৌখরি মুদ্রায় গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। তাঁহারা নিজেও একটা নূতন অব্দ প্রচলন করেন। বার্ণ্ অনুমান করেন, মুখরাব্দ ৪৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আরব্ধ হয়।(৫৬) কোন্ সময় মগধে মৌখরিবংশীয় বর্ম্মরাজগণের পতন হয় জানা যায় না। হর্ণলি অনুমান করেন, (৫৭) হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই উত্তরাপথে মৌখরিগণের রাজত্বগৌরব খর্ব্বীভূত হইয়াছিল। সমগ্র মগধের অধিনায়কত্বলাভ মৌখরিগণের ভাগ্যে ঘটে নাই, গুপ্তরাজবংশের পতনের পর বিপ্লব ও বিসংবাদের গভীর আর্ত্তনাদ মগধের চতুর্দ্দিক্ হইতে উত্থিত হইতেছিল।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

---

(৫৬) J. R. A. S. 1906, Pp. 848—49.

(৫৭) J. A. S. B., 1889, Part I, P. 102.

# সুর

[ কথা-চিত্র ]

১

সে কেবল রঙের নেশায় বিভোর হইয়া থাকিত। যখন প্রথম পাখীর ডাকে জগৎকে ডাকিয়া তুলে, আকাশে সোনার আলো ছড়াইয়া পড়ে, সেও জাগে—জাগে...তাহার সেই অপার অনন্ত আকাশের কোলে রঙের পর রঙ কেমন খেলে তাহাই দেখিবার জন্য—আর সে অনিমেষ নয়নে তাহাই দেখে,—দেখে, দেখে,—ডুবিয়া যায়, তাহার চোখের তারকায় তখন আর রঙও থাকে না,...থাকে কেবল একটা খেলার ঢেউ যা তাহার অন্তরের অন্তরতম দেশে দুলিয়া দুলিয়া ছাপাইয়া উঠে। দিনের পর দিন এমনি করিয়া কাটিল, রঙের ঢেউ দুলিতে দুলিতে চলিল, তাহার জীবনের পাতেও অনেক রঙ ফলিল। সে হইল পটুয়া। লোকে বলিল ওটা পাগল... মাথায় একরাশ চুল, বসন ভূষণ অসংযত, চক্ষু উজ্জ্বল উদাস, চলিতে চরণ টলে,—যেন মাতাল। এম্‌নি বিভোরে দিন ভাসিয়া গেল। তুলি ধরে, দেখে, ছবি আঁকে।

২

চন্দ্রমা-শালিনী-নিশীথে পাগল একদিন দেখিল পাষাণ দীর্ণ করিয়া ঝর্ঝর করিয়া জলপ্রপাত ঝরিতেছে। চাঁদের আলো সেই ঝরণার উপর পড়িয়া সে এক রূপের খেলা খেলিতেছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে এক করুণ সুর। সমস্ত আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিতেছে।—পাগল শুনিল একসুর—অন্তরের নিভৃত নিলয়ে সুপ্ত বীণার তার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাজিয়া উঠিল।—পাগল দেখিল শুধু রঙ নয় সুর। পাগল খুঁজিতে গেল রঙে আর সুরে মিল কোথায়? মিলন না হইলে

যে প্রাণের পিয়াসা মিটে না। রঙের ভিতর যে লুক্কায়িত অভাব, যে বিরহ মিলনের জন্য হাহা করিতেছে তাহার সন্ধান করিতে চাহিল। পাগল বুঝিল শুধু রঙে চলে না সুর চাই। হৃদয়ের পাতে পাতে অন্বেষণ করিল, কানন কান্তারে, দরী গিরি কটীতটে, তুঙ্গশৃঙ্গে খুঁজিতে লাগিল সে সুর কোথায়...হাহা!...বিরহ ত্রিভুবন জুড়িয়া হাহা করিয়া উঠিল।

৩

দিন গেছে, বৎসর গেছে, পটুয়া বিশ্ববিশ্রুত নাম কিনিয়াছে, কত বিরাট পৌরাণিকী চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। কত ক্ষুধিত নর-নারী শীর্ণ বিশীর্ণ নগ্ন কান্তি আঁকিয়াছে, কিন্তু তার সুরের তৃষা মিটে নাই। রঙের পর রঙ চাপায় মানুষে অবাক হইয়া দেখে বলে, ইহা প্রতিভা, অনন্যসাধারণ, ইহা জীবন্ত। কত সুন্দরী রূপসী চরণতলে লুটাইতে চায়। কত মহিমাই তার লোকের মুখে গীত হয়, তাহার উত্তরীয় স্পর্শের জন্য কত জনেই ব্যাকুল। কিন্তু হায়! পটুয়া, বিরস ক্ষুণ্ণ অন্তর্জ্বালায় জ্বলিয়া মরে...সেত তাহাদের চায় না—সে যে চায় সুর, তাহা যে সে রঙের সহিত মিলাইতে পারে না। সে দারুণ বিরহের দহনে দগ্ধ, তাপে তাপিত, তৃষায় তৃষিত, সুধু কানের কাছে তার অন্তর পড়িয়া রহিয়াছে, সে যে বিরহী, চিরবিরহী এ কথা ত কেউ বুঝে না। লোকের গৌরব ত তার চরণের ধূলা। সেত পথের কথা। ধূলাখেলার রচনা। পটুয়া তখন ভাবিতেছিল, এই রঙেই কি আছে, যাতে সুর বাজে, নহিলে মিলন কি করিয়া হইবে। এ বিরহের কি শেষ নাই!

৪

পটুয়া গৃহকর্ম্ম দেখে না। রূপের কাছেই সে পড়িয়া থাকে। পটুয়ার প্রিয়তমা সুন্দরী। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। তার রূপ তারই রূপ। তার প্রিয়তমা চায় তাহার সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইতে। সুন্দর যে ভোগেই চরম সার্থকতা লাভ মনে করে...

সে চায় আগুনে পুড়াইতে...কিন্তু হায়! পটুয়া সে রূপের আগুনে পতঙ্গবৃত্তিতে পুড়িতে পারিল না—সে যে চায় রঙের ভিতর সুর—তাহা কই! রূপের দীপ্তিতে প্রাণের তৃষা মেটে না ..পটুয়া ভাবে ওই যে রূপের আড়ালে সুর লুকাইয়া আছে। সুর পলাইতে চায়, পটুয়া ধরিতে চায়। ভাবে এই রঙের ভিতরে আমি সুরের খেলা খেলিব। না হইলে জীবনই বৃথা। সুর বাজে, রূপ তাহারে লুকায়। এই লুকোচুরি ধরিতে পটুয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। সুন্দরী তাহাকে রূপে বাঁধিয়া রাখিতে চায়—পটুয়া সে খণ্ডরূপের মাঝে নিজেকে বাঁধ দিয়া রাখিতে পারে না...মুক্তি ও বাঁধনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল...তার পর পটুয়া একদিন রঙ ও তুলি লইয়া বসিল। মনে দৃঢ়, যে, সে আজ সুরকে এই রঙের মধ্যেই ধরিবে ও জগতের কাছে তাহাকে ধরিয়া দিবে। হারে চোর! তুমি কেমন করিয়া এতকাল লুকাইয়া বেড়াও দেখিব। কেবল রঙের ধোঁকায় আমাকে ভুলাইতে চাও। পটুয়া তুলি ধরিল। আকাশ, বাতাস, ধরা স্তম্ভিত, পটুয়া আজ সুরকে বাঁধিবে!!! রূপের দেশে সুরের নেশায় আজ পটুয়া নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে। রূপ আজ সুরের ধ্যানে বসিল।

৫

পটুয়ার সম্মুখে প্রিয়তমা, ওদিকে তূর্য্যধ্বনি করিয়া প্রভাত, আলো ছড়াইয়া আসিতেছে...প্রভাতের আলোর উপরে সেই প্রিয়-তমার রূপ—পটুয়ার তুলিকা নড়িতেছে, রঙের পর রঙ খেলিতেছে, কিন্তু তবুও সুরের আভাস পাওয়া গেল না। সুন্দরী দেখিল একি! এত শুধু আমি নয়, আমার রূপ নয়, পটুয়ার তুলিকা চলিতেছে—ওই চক্ষুতে, ওই অধরে, ওই উরসে, ওই পদতলে সহস্রদল ফুটিয়া উঠিতেছে, ওই বরণায়ত বর্ণিকাভঙ্গে রূপ ধরা দিয়াছে...কিন্তু সুর কই? কই সে সুর কই, কই! কই! সে মিলনের রাগিণী ওই বাজে না? বাজে...না...ওই পলায়...ওই যে বক্ষ দুলিয়া

উঠিল, ওই যে সুর, ওই...ওই...না...তুলিকা স্থির—পটুয়া নিশ্চল, আর একবার শুনিলেই পটুয়া তাহাকে রঙের ভিতর ধরিবে—ওই, ওই যে অধর একটু পাপড়ি আলগা হইল, ওই সে নিশ্বাসে কি সুর বাজিল, ওই ওই, যে বাতাসে কার সুর...পটুয়া নাসার তিলক রচনার কাছে আর একবার তুলি স্পর্শ করিয়া বলিল..."ধরেছি ধরেছি" ...পরক্ষণেই তার প্রিয়তমা সেই অঙ্কিত চিত্রের তলে ঢলিয়া পড়িল...কি! কি!...পটুয়া দেখিল এই সুর...ঝনন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল...সুন্দরী তরুণীর তখন শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশাইয়া গেছে। ...পটুয়া নিজের বুকের ভিতর শুনিল—এক বিরাট ক্রন্দন, বিশ্বভরা বিরহের সুর। আকাশে তখন কোথা হইতে মেঘে ধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।...পটুয়ার আঁখি-কোণে দুই বিন্দু জল টল্‌টল্ করিতেছে।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

---

## প্রেমভিখারী

আমার মাঝে
কি রস আছে
ওগো রসাধার!

তাই ভ্রমর হয়ে
গান বুকে ল'য়ে
ফের দ্বারে দ্বার?

কতবার তোমারে
সবাকার মাঝারে
করেছি অপমান,

তবু নানা ছলে
কিছু নাহি বলে
গেয়েছ তব গান।

আমায় না হলে
লীলা নাহি চলে
ওগো লীলাধার!—

তাই এস ছুটে
সব বাধা টুটে,
প্রেমিক আমার!

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

# গান

দাও দাও প্রাণের নিধি
প্রাণের প্রাণে বেঁধে দাও।
(আমার) সকল অঙ্গ কেঁদে মরে
চোখের কাছে এনে দাও!

আমি সইতে নারি দূরে থেকে
চোখের কাছে এনে দাও,
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও।

ভাব্‌তে গেলে তোমার কথা
সকল অঙ্গ শিহরে;—
ভুল্‌তে গেলে তোমার কথা
বুকের মাঝে বিছরে।

আমি, ভাব্‌তে নারি ভুল্‌তে নারি! —
তোমার কাছে ডেকে নাও
বুকের ধন বুকের মাঝে
বুকের 'পরে বেঁধে দাও!

———

# নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা ]　　　　[ আষাঢ়, ১৩২৩ সাল

## "তদুচিত গৌরচন্দ্র"

[ ২ ]

( বৈশাখের "নারায়ণের" ৫৭১ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি )

মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকে বিধেয়-স্বরূপ, আর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাকে তাহার অনুবাদরূপে গ্রহণ করিলে, "তদুচিত গৌরচন্দ্রের" একটা সঙ্গত অর্থ হয়, সত্য; কিন্তু তাহাতেও সকল প্রশ্নের সমাধান হয় না।

প্রথমে আমাদের কথাই উঠে। গৌরাঙ্গলীলাও ত আমরা দেখি নাই। মহাপ্রভুর পারিশার্ষদেরাই তাঁর লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, আমাদের নিকটে কৃষ্ণলীলা যেমন পুরাণ-কথা মাত্র, গৌরাঙ্গলীলাও ত তাই। উভয়ই আমাদের অজ্ঞাত, উভয়ই আমাদের নিকটে বিধেয় স্বরূপ। আমরা এই গৌরাঙ্গলীলার অনুবাদ কোথায় পাইব?

তারপর, মহাপ্রভুর আসন্ন ভক্তগণ সম্বন্ধেও সকল কথার সমাধান হয় না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বাহিরের আচার-আচরণই ইঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিল। মহাপ্রভুর শরীর মনের নানা প্রকারের ভাবান্তরই ইঁহারা চাক্ষুষ করিয়াছিলেন। এসকল

ভাবান্তর যে রসের লীলা; সাত্ত্বিকী বিকার; পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ প্রভৃতি আন্তরিক অবস্থার প্রমাণ;—একথা বলিল কে? মহাপ্রভুর সমসাময়িক কোন কোন লোকে ত তাঁর এসকল সাত্ত্বিকী বিকারকে উন্মাদ, অপস্মার, বা মৃগীরোগ বলিয়া মনে করিত। এসকল যে রোগের লক্ষণ নয়, উচ্চতম আধ্যাত্মিক অবস্থার পরিচায়ক, মহাপ্রভুর ভক্তগণই বা ইহা জানিলেন কিরূপে?

কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পুরাকালে দুই ভিন্ন দেহেতে যে প্রেমলীলা বা রসলীলা প্রকট করিয়াছিলেন, অধুনা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, একই দেহেতে সেই লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে কোন্‌টিকে বিধেয়, আর কোন্‌টিকে অনুবাদ বলিব?

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ

আগে অনুবাদ না কহিয়া, কদাপি বিধেয়ের উল্লেখ করিবে না। এখানে আগে ত রাধাকৃষ্ণের কথাই পাই।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মনাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকাররূপিণী হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা। অতএব —অর্থাৎ শক্তি আর শক্তিমান এক বলিয়া—রাধাকৃষ্ণ একই বস্তু, একাত্মা। তথাপি পুরাকালে ইঁহারা ভিন্ন দেহ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনলীলা করিয়াছিলেন। অধুনা সেই দুই (রাধা আর কৃষ্ণ) এক হইয়া শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ এই শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করি।

এখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারতত্ত্বটি বিধেয় স্বরূপ। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। আর রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাটি এখানে অনুবাদ স্বরূপ। কবিরাজ গোস্বামী ধরিয়া লইয়াছেন যে রাধাকৃষ্ণকে

লোকে জানে। রাধাকৃষ্ণ যে একই বস্তু, ইহাও লোকে জানে। একাত্মা হইয়াও পুরাকালে ইঁহারা ভিন্ন দেহেতে লীলা করিয়াছিলেন, একথাও লোকে জানে। এগুলি যে জ্ঞাত, ইহা ধরিয়া লইয়াই, গোস্বামী কহিতেছেন— সেই রাধাকৃষ্ণই অধুনা একই দেহেতে মিলিত হইয়া, এই শ্রীচৈতন্য নামে প্রকট হইয়াছেন। এই শ্রীচৈতন্য একদিকে জ্ঞাত। ইঁহার জন্মকর্ম্ম ঐতিহাসিক ঘটনা। ইঁহার মানবতা আমাদের জ্ঞাত। ইঁহার মানবদেহ লোকের চক্ষুগোচর হইয়াছিল। কিন্তু এই মানবরূপী শ্রীচৈতন্য যে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, ইঁহার এই প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের দেহই যে শ্রীরাধার ভাবকান্তির দ্বারা সুবলিত, এসকল কথা অজ্ঞাত।

সুতরাং এই শ্লোকেতে দুইটি অনুবাদ, ও তিনটি বিধেয় পাইতেছি। এখানে দুইটি বস্তু জ্ঞাত—প্রথম রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যের মানবত্ব। আর তিনটি অজ্ঞাত—প্রথম শ্রীচৈতন্যের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের একত্ব, দ্বিতীয় শ্রীচৈতন্যের দেহ শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি দ্বারা সুবলিত; ও তৃতীয় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্ব।

কিন্তু যে রাধাকৃষ্ণতত্ত্বকে কবিরাজ গোস্বামী এখানে অনুবাদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কি সত্য সত্যই জ্ঞাত? আমরা কি এই তত্ত্ব জানি? যদি জানি বলি, তবে কখন, কোথায়, কিরূপে জানিলাম—এই প্রশ্ন উঠে। আর যতক্ষণ না এই গোড়ার প্রশ্নের একটা মীমাংসা হইয়াছে, ততক্ষণ কবিরাজ গোস্বামীর শ্লোকের কোনও অর্থ হয় না।

যদি বল, রাধাকৃষ্ণের কথা ভাগবতে আছে, ভাগবত পড়িয়া রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব জানি; তাহাও সত্য নহে। কারণ ভাগবতে আমরা কতকগুলি শব্দমাত্র দেখিতে পাই। শব্দ বস্তুর চিহ্ন বা সঙ্কেত মাত্র, বস্তু নহে। আর জানা ব্যাপারটা বস্তুর প্রত্যক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে। যে শব্দ যে বস্তুর চিহ্ন বা সঙ্কেত, সেই বস্তু যে দেখিয়াছে বা জানিয়াছে, সে'ই কেবল সে-শব্দের মর্ম্ম বুঝে। রাধা

কৃষ্ণ দুইটি শব্দ মাত্র। এদেশে স্ত্রীলোকের নাম রাধা হয়, পুরুষের কৃষ্ণনাম হইয়া থাকে। রাধা নাম্নী কোনও স্ত্রীলোককে যে জানে, কৃষ্ণনামে কোনও পুরুষ যার পরিচিত, রাধাকৃষ্ণ বলিতে সে ইহাদেরেই বুঝিবে। যারা লোকমুখে শুনিয়াছে যে রাধাকৃষ্ণ দেবতাবিশেষ, রাধাকৃষ্ণ নামে তাহাদের মনে একটা দেবতাবুদ্ধির উদয় হইবে। যারা পড়িয়াছে যে শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ, ত্রিভঙ্গ, মুরলীধর, আর শ্রীরাধা অলোকসামান্যা রূপসী, বর্ণ তাঁর গৌর, পরিধানে তাঁর নীলাম্বর,—রাধাকৃষ্ণের নামে তাহাদের চিত্তে এই ছবিই ফুটিয়া উঠিবে। রাধাকৃষ্ণনামের সঙ্গে যার অন্তরে যে ভাবের প্রত্যক্ষ জড়াইয়া গিয়াছে, ভাগবত পড়িয়া সে সেই ভাবই কেবল গ্রহণ করিবে। কবিরাজ গোস্বামী যে-রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন, এই তত্ত্ব যার প্রত্যক্ষ হয় নাই, ভাগবত পড়িয়া সে তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং ভাগবত পড়িয়া আমরা রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব জানি বা জানিতে পারি, এমন কথা বলা যায় না। বস্তু-সাক্ষাৎকারেই বস্তুজ্ঞান লাভ হয়, পুস্তক পড়িয়া হয় না।

তবে কি কবিরাজ গোস্বামীর এই শ্লোকের অর্থবোধ সম্ভব নহে? এমন কথা বলি না। এই শ্লোকে রাধাকৃষ্ণ ছাড়া আরও দু'চারিটি কথা আছে, সেই কথাগুলিকে ধরিয়া আমরা ইহার মর্ম্ম কতকটা উদ্ঘাটন করিতে পারি। যেমন চৈতন্যাবতারের অনুবাদ রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, সেইরূপ এই শ্লোকে

প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিঃ

ইহা রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের অনুবাদ। এই শ্লোকের প্রথম শব্দ "রাধা"। এই শব্দ শ্রবণমাত্র মনে প্রশ্ন উঠে, এই রাধা কে? কবিরাজ গোস্বামী কহিতেছেন—এই রাধা আর কেহ নহে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকাররূপিণী হ্লাদিনী-শক্তি। এখানে আমরা তিনটি বস্তু স্বল্পাধিক জানি। সে তিনটি বস্তু,—প্রণয়, বিকার, আর শক্তি।

আর হ্লাদিনী কথাটিও বুঝিতে যে না পারি এমনও নয়। প্রথম কথাটি প্রণয়—ভালবাসা। নিতান্ত হতভাগ্য না হইলে এই প্রণয়-বস্তুর স্বল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ আমাদের হইয়াছে। সুতরাং প্রণয় যে কি, ইহা মোটের উপরে জানি। আর ইহাও জানি যে কাউকে না কাউকে আশ্রয় করিয়া এই ভালবাসা আমাদের প্রাণে জাগিয়া উঠে; শূন্যকে ধরিয়া ভালবাসা জন্মে না। তারপর ইহাও দেখি যে ইচ্ছা করিলেই যাকে-তাকে আমরা সত্যভাবে, গভীররূপে ভাল-বাসিতে পারি না। এখানে কোনও প্রকারের জোর্‌জবরদস্তি চলে না। আর এই ভালবাসার ভিতরে যেন একটা নিতান্ত খামখেয়ালি ভাব আছে,—এই ভালবাসার কোনও বোধগম্য হেতু নির্দ্দেশ করা যায় না। এবস্তু অহৈতুকি। আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে দেখি যে এই ভালবাসাতে আমরা যেমন আনন্দ পাই, তেমন আর কিছুতে পাই না। আর আমরা যাহাকে ভালবাসি সে আমাদের এই আনন্দের বা প্রণয়ের মুর্ত্তিরূপেই যেন আমাদের নিকটে প্রকাশিত বা উপস্থিত হয়। আমাদের অন্তরের প্রণয়বস্তু বা আনন্দবস্তু ঘনীভূত হইয়া, সাকার মূর্ত্তি ধরিয়া, আমাদের প্রণয়ী বা প্রণয়িণীরূপে আমা-দের সম্মুখে আসিয়া, আমাদের ভালবাসা গ্রহণ করে ও আমাদিগকে ভালবাসা দিয়া আনন্দিত করিয়া থাকে। আমাদিগকে আনন্দিত করে বা অনুপম সুখ দেয় বলিয়া, প্রণয়ের এই শক্তিকে হ্লাদিনী বলা হয়। যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রণয় পরিতৃপ্ত হয়, তাহা সেই প্রণয়েরই ঘনীভূত মূর্ত্তি বলিয়া, তাহাকে প্রণয়ের বিকার বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ী-বিশেষ। আমাদের প্রণয়ের অভিজ্ঞতা দিয়া তাঁর প্রণয়িত্বের অনুবাদ করিতে পারি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের আশ্রয়। আমাদের প্রেমপাত্রের অভিজ্ঞতার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্রী শ্রীরাধিকার স্বরূপের কথঞ্চিৎ অনুবাদ করিতে পারি। আর আমাদের এই সামান্য. সাধারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা—"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিঃ"—নিজেদের অনুভবের সাহায্যেই এই পদের

অর্থ বুঝিতে পারি। আর এই অনুভব যার হইয়াছে সে এইটুকু অন্ততঃ সহজেই বুঝিবে যে শ্রীকৃষ্ণ যিনিই হউন না কেন, তিনি প্রণয়ী; আর শ্রীরাধাও যিনিই হউন না কেন, তিনিই এই প্রণয়ীর প্রণয়পাত্রী। তার পর, প্রেমবস্তুর আস্বাদন যে'ই পাইয়াছে, সে'ই ইহা জানে যে প্রেমিক-প্রেমিকার ঐকান্তিক একাত্মতা সাধিত না হইলে প্রেম কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করে না, করিতে পারে না। মানুষ যখনই এই প্রেমে পড়ে তখনই আপনার প্রেমপাত্রের সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়া মিশিয়া যাইবার জন্য আকুলি-বিকুলি করে। ইহারই জন্য আসঙ্গলীপ্সা প্রেমের একটা নিত্য ধর্ম্ম। পিপাসিত প্রেম তাই সর্ব্বদাই বলে—"অগরু-চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখিতাম, ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়।" প্রেমের এই দুরন্ত, জ্বলন্ত পিপাসার উৎপত্তি কোথায়? ইহার হেতু কি? ইহার নিবৃত্তিই বা কোথায়? প্রেমের এই একাত্মতা-প্রাপ্তির পিপাসা পূর্ব্বসিদ্ধ একত্বের প্রমাণ করে। আর এই গভীর মর্ম্মশোষী আকাঙ্ক্ষা যদি কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইলে প্রেমের কোনও সত্যতা এবং সার্থকতা থাকে না। এই অপূর্ব্ব রসবস্তু মায়ামরীচিকাতে পরিণত হয়। সমগ্র সৃষ্টি তবে নিষ্ফল হইয়া যায়। আবার প্রণয়ীযুগল যদি স্বরূপতঃ একই বস্তু না হয়, তাহা হইলেই বা এ আশঙ্কা নিবৃত্তির সম্ভাবনা কৈ? বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে প্রেম সম্ভবে না। সুতরাং ভালবাসার অনুভব যারই হইয়াছে, এই উন্নতোজ্জ্বলরসশ্রী যাঁর চিত্তে একবার ফুটিয়াছে, সে ইহাও জানে এবং বুঝে যে প্রণয়ীযুগলের দ্বৈত ও স্বাতন্ত্র্য আকস্মিক মাত্র, নিত্য নহে। তাঁহাদের ঐক্যই মৌলিক ও নিত্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যিনিই হউন না কেন, শ্রীরাধা যিনিই হউন না কেন, ইঁহারা প্রণয়ীযুগল, এই কথা জানিলেই, ইঁহারা যে মূলে একাত্মা, প্রেম-প্রয়োজনে, লীলার জন্য, দেহভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ভালবাসার সত্য অনুভব যার হইয়াছে, সে'ই এই কথাও সহজেই বুঝিতে পারিবে। অতএব

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ—

এই শ্লোকার্দ্ধে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অভিধেয়-স্বরূপ, আর আমাদের নিজ নিজ প্রণয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতা, ইহার অনুবাদ-স্বরূপ হইয়াছে। নিজের প্রণয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব ও অভিজ্ঞতার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুবাদ করিতে হয়। এইরূপে, এই অনুবাদের সাহায্যে, রাধাকৃষ্ণলীলাটি যখন অন্তরঙ্গ অনুভবের বিষয় হইয়া উঠে তখন ইহাকেই আবার গৌরাঙ্গলীলার অনুবাদস্বরূপ গ্রহণ ও প্রয়োগ করিতে হয়। "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়-বিকৃতি" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে এই কৃষ্ণলীলা বিধেয়-স্বরূপ, আমাদের প্রেমের প্রত্যক্ষ অনুভব ইহার অনুবাদ। আবার এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে শ্রীচৈতন্যের অবতার বিধেয়রূপে আর রাধাকৃষ্ণের লীলাই তার অনুবাদরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ,—যে রাধাকৃষ্ণ মূলে একাত্মা হইয়াও, পুরাকালে দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার ঐক্যলাভ করিয়া অর্থাৎ একই দেহগত হইয়া, অধুনা শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন।

আমরা যদি এখন এই চৈতন্যলীলাকে কৃষ্ণলীলার অনুবাদরূপে ব্যবহার করিতে চাই, আর এই জন্য কৃষ্ণলীলাকীর্ত্তনের আদিতে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া, "তদুচিত গৌরচন্দ্র" গান করি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ করিতে হইবে। নতুবা এই গৌরাঙ্গলীলাকীর্ত্তন বন্ধ্যাপুত্রবৎ অলীক ও কল্পিত থাকিয়া যাইবে।

ফলতঃ একটু তলাইয়া দেখিলে, শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অপেক্ষা রাধা-কৃষ্ণলীলা বুঝা সহজ বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ী, প্রণয়ীর শিরোমণি। শ্রীরাধিকা তাঁর প্রণয়িনী, তাঁর সর্ব্বার্থসাধিকা। আমাদের নিজেদের সামান্য প্রণয়ের অভিজ্ঞতার দ্বারা রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমলীলার কিছু না কিছু আভাস পাইতে পারি। সত্য বটে, আমাদের প্রেম আবি-

লতাময়, রাধাকৃষ্ণ প্রেম অনাবিল। আমাদের প্রেমে আত্মসুখবাঞ্ছা আছে, ইহা অনেক সময় প্রেম নহে, কিন্তু কাম; রাধাকৃষ্ণপ্রেমে এই আত্মসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই। আমাদের প্রেমের সঙ্গে শারীর বিকার জড়াইয়া থাকে, রাধাকৃষ্ণপ্রেম বিশুদ্ধ, অশরীরী, আধ্যাত্মিক ব্যাপার। কিন্তু এসকল সত্বেও আমাদের এই অশুদ্ধ, কামগন্ধময়, আত্মসুখলীপ্সু ভালবাসাতেও প্রেমের সাধারণ ও নিত্য ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। ঘোলা জলে আর নির্ম্মল স্বচ্ছ জলে যে পার্থক্য, অবিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ বায়ুতে যে পার্থক্য, আমাদের এই প্রেমে আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমেও সেইরূপ পার্থক্য আছে, স্বীকার করি। কিন্তু ঘোলা জলও ত জল। বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য জলেতে যেমন জলের সাধারণ ও নিত্য-ধর্ম্ম আছে, সেইরূপ অবিশুদ্ধ কর্দ্দমাক্ত জলেতেও তাহা অবশ্যই আছে, না থাকিলে ইহা জলই হইত না। সেইরূপ আমাদের এই অশুদ্ধ প্রেমেতে প্রেমের সাধারণ ও নিত্যসিদ্ধ ধর্ম্ম অবশ্যই আছে, না থাকিলে ইহা প্রেমপর্য্যায়ভুক্তই হইতে পারিত না। আর সাধারণ প্রেমধর্ম্মবশেই, আমরা আমাদের এই প্রেমের দ্বারাই, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের একটু-আধটু আভাস পাইয়া থাকি। এই প্রেম দিয়া সেই প্রেমের স্বল্প-বিস্তর অনুবাদ করিতে সমর্থ হই। এই প্রেম আর সেই প্রেম যদি একান্ত ভিন্ন হইত, তাহা হইলে আমরা রাধাকৃষ্ণের প্রেম যে কি, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না।

আমাদের প্রেম যুগল নইলে হয় না। এই প্রেমে দুইজন চাই, এক প্রণয়ী অপর তাঁর প্রণয়পাত্রী, এক নায়ক অপর নায়িকা, এক পতি অপর সতী। রাধাকৃষ্ণের প্রেমও সেইরূপ দুইকে লইয়া— এক কৃষ্ণ, অপর রাধা। অদ্বৈতের প্রেম যে কি, ইহা আমরা বুঝি না, ইহার কোনও অনুবাদ আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাতে নাই। বিশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন—"কে কাহার দ্বারা কি দেখে? কে কাহার দ্বারা কি শোনে?" অদ্বৈতের প্রেম সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে হয়—কে কাহাকে ভালবাসে? অদ্বৈত

ব্রহ্মেতে যখন আমরা প্রেমধর্ম্ম আরোপ করি, তখন অনেক সময় নিজেদেরে, এই জীবমণ্ডলীকে, সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া ভাবিয়া লই। কিন্তু আমরা ত অপূর্ণ, অনিত্য, পরিণামী। অনিত্যকে ভালবাসিয়া নিত্যপ্রেম কদাপি তৃপ্ত হইতে পারে না, অপূর্ণকে প্রেম করিয়া পূর্ণপ্রেম কদাপি সার্থক হইতে পারে না। প্রেমে সজাতীয়তা ও সমানধর্ম্ম অন্বেষণ করে। সমানে সমানে নইলে সত্য প্রেম হয় না, হইলেও পূর্ণতা লাভ করে না। অতএব অপূর্ণ ও পরিণামী জীবকে লইয়া পূর্ণব্রহ্মের নিত্যসিদ্ধ-প্রেম সম্ভব হইতেই পারে না। এই কারণেই, পরমতত্ত্বের প্রেমলীলার প্রয়োজনানুরোধে, পূর্ণব্রহ্মের অখণ্ড অদ্বৈত সত্তা ও স্বরূপের মধ্যেই দ্বৈতের ও ভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। পরমতত্ত্ব একই সঙ্গে দ্বৈত ও অদ্বৈত। পরমতত্ত্বের অদ্বৈত-তত্ত্বই উপনিষদের ব্রহ্ম। আর তাঁহার দ্বৈত-তত্ত্বই ভাগবতের রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব। এইজন্য অদ্বৈত ব্রহ্মের প্রেম যে কি, ইহা আমরা বুঝি না। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কিছু বুঝিতে পারি। কারণ, আমরা সাক্ষাৎভাবে, নিজেদের প্রেমের অভিজ্ঞতাতে প্রেম যে দুই না হইলে জন্মে না, যুগলাশ্রয়েই যে প্রেমের জন্ম হয়, আর এই প্রেম এই যুগলকে সর্ব্বদাই এক করিতে চাহে, ইহা দেখি। এই জন্য আমাদের এই প্রেমের দ্বারা আমরা রাধাকৃষ্ণলীলার কথঞ্চিৎ অনুবাদ করিয়া, তার নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ ও আস্বাদন করিতে পারি।

কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাতেও ত কোনও প্রত্যক্ষ দ্বৈতাশ্রয় বা যুগলাশ্রয় নাই। আমাদের প্রেমের অনুবাদে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমলীলা বুঝিতে হইলে নবদ্বীপে, সংসারাশ্রমে থাকিতে, শ্রীমতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী কিম্বা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাঁর যে দাম্পত্য সম্বন্ধ গড়িয়াছিল, তাহারই অনুশীলন করিতে হয়। কিন্তু "তদুচিত গৌরচন্দ্রে" কোথাও ত এরূপভাবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর বা বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর উল্লেখ নাই। মহাপ্রভু যে নিজের মধ্যেই নিজে পূর্ব্বরাগ, মিলন, মান, বিরহাদির অভিনয় ও আস্বাদন করিয়া-

ছিলেন। তিনি যে আপনি একাধারে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী, নায়ক ও নায়িকা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা। আমাদের প্রেমে নায়ক-নায়িকা, পতি-পত্নী, পুরুষ-প্রকৃতি, এই যুগল সর্ব্বদাই প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য এই প্রেমের অনুবাদে আমরা রাধাকৃষ্ণের যুগল প্রেমের মর্ম্ম কিছু কিছু ধরিতে ও বুঝিতে পারি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমলীলাতে এরূপ প্রত্যক্ষ কোনও যুগল-আশ্রয় ত নাই। এ অদ্ভুত প্রেমের অনুবাদ তবে পাই কোথায়?

তবে ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা দেখি যে যেমন দ্বৈত, বা যুগল না হইলে প্রেম হয় না; আবার সেইরূপ, এই দুই যদি সজাতীয় না হয়, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যদি একটা মৌলিক একত্ব না থাকে, তাহা হইলেও প্রেম সম্ভব হয় না। আমাদের নিজ নিজ জীবনে প্রেমের অনুভব ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই প্রেমের এই দ্বৈত-রূপ ও অদ্বৈত স্বরূপ উভয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ভালবাসার বস্তু আপাততঃ আমাদের বাহিরে, আমাদের হইতে পৃথক হইয়া প্রকাশিত হইলেও, ইহা যে আমাদেরই অন্তরঙ্গ বস্তু, আমাদের প্রাণের, আমাদের আত্মার প্রতিরূপ, আমাদের প্রেমই সর্ব্বদা যেন এই কথা বলে। যাহা আমাদের ভিতরের নহে, তাহাকে আমাদের ভিতরে স্থান দিতে পারি না। যাহা আমাদের নহে, তাহাকে সত্যভাবে আমাদের করিতেও পারি না। যাহাকে ভালবাসি সে আমাদের ভিতরের বস্তু বলিয়াই, তাহাকে অমন করিয়া ভিতরে টানিয়া লইতে পারি। সে আমাদের আপনার বলিয়াই, অমন করিয়া তাহাকে আপনার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন করিয়া গ্রহণ করি। তাহার সঙ্গে আমাদের একত্ব আজিকার সৃষ্টি নয়, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ, এই জন্যই তাহাকে জ্ঞানতঃ নিজের করিয়া লইতে না পারিলে, আমাদের প্রেমের সঙ্গে প্রাণও যেন অপূর্ণ, আধখানা হইয়া রহে। ফলতঃ আমাদের ভিতরে, আমাদের আত্মার মধ্যে যার স্বরূপ লুকাইয়া নাই, বাহিরে তার রূপ দেখিয়া আমাদের অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠে না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মনে হয়, প্রেমিকযুগল দুই নয়, কিন্তু এক। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রেমের সার্ব্বজনীনতত্ত্ব। রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী যাহা কহিয়াছেন, সকল প্রেমিকযুগল সম্বন্ধেই তাহা খাটে। প্রেমিকযুগল মাত্রই—

একাত্মানাবপি ভুবি দেহভেদং গতৌ তৌ—

একাত্ম হইয়াও এ সংসারে যেন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্ব্বত্রই প্রেমিকেরা এই কথা কহিয়াছেন। মার্কিন ভাবুক থিওডোর পার্কার কোনও দিন ত রাধাকৃষ্ণের লীলাকথা শুনেন নাই, অথচ তিনিও প্রেমের বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে প্রেমিকপ্রেমিকার দুই দেহেতে যেন একই আত্মা বিরাজ করে, দুই হৃদয়ে একই প্রাণ যেন স্পন্দিত হয়। অতএব আমাদের এই পার্থিব প্রেমের অনুভবেও আমরা বাহিরের দেহভেদের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরের একাত্মতার সন্ধান পাই। আর এই সন্ধানের মধ্যেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমলীলার মর্ম্ম ও অর্থের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আর এই অনুসন্ধানের গোড়াতেই একটা কথা ভাল করিয়া ধরিতে ও বুঝিতে হইবে। সে কথাটি এই যে, কবিরাজ গোস্বামী এখানে যে রাধাকৃষ্ণের কথা কহিয়াছেন তাহা যেমন তত্ত্ববস্তু; এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বের আশ্রয়ে তিনি যে চৈতন্যাবতার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাও সেইরূপ তত্ত্ববস্তু। যাহার দ্বারা কোনও জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয়, তাহাই তত্ত্ব। জিজ্ঞাসা অর্থ জানিবার ইচ্ছা। জানিয়াই কেবল জানিবার ইচ্ছার নিবৃত্তি হইতে পারে, অন্য উপায়ে হয় না। যাহা জানি তাহাই জ্ঞান। অতএব তত্ত্বমাত্রেই জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু। আর জ্ঞানমাত্রেই অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয়। "অনুভূতি পর্য্যন্তং জ্ঞানং।" যে জ্ঞান অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয় না, তাহার দ্বারা কোনও জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইতে পারে না। আর যাহাতে কোনও জিজ্ঞাসার নিঃশেষ নিবৃত্তি হয় না, তাহা যখন তত্ত্ব নয়; তখন যতক্ষণ না কোনও বস্তুর বা বিষয়ের পরিপূর্ণ ও

প্রত্যক্ষ অনুভব জন্মিয়াছে, ততক্ষণ তাহাকে তত্ত্ব বলা যায় না। এই জন্য পৌরাণীকি কিম্বদন্তির রাধাকৃষ্ণ-লীলা উপকথা মাত্র, তত্ত্ব নহে। যে রাধাকৃষ্ণ-লীলা সাধকের অপরোক্ষ অনুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই কেবল তত্ত্ব।

এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হইতে হয়। এবিদ্যা গুরুমুখী সত্য, কিন্তু গতানুগতিকপন্থী নহে। এপথে যে সংস্কারবদ্ধ হইল, সে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে না। অন্ধকার রাত্রে বিজন, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মানুষকে যেমন ভূতে পায়, সংস্কারবদ্ধ সাধককে সেইরূপ এই সকল সংস্কারে পায় ও অপথে কুপথে লইয়া হায়রাণ করে। রাধাকৃষ্ণ যে তত্ত্ববস্তু, ইহা যে জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, প্রত্যক্ষ অনুভব ব্যতীত এই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝা যে অসাধ্য, ইহা বিস্মৃত হইয়া, পুরাণ-কথা হইতে যে লৌকিক সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহার দ্বারা জড়িত হইয়াই মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত অমন যে শুদ্ধা সাত্ত্বিকী ভক্তিপন্থা, তাহার আশ্রয়ে সহজীয়া প্রভৃতি বামমার্গের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃতিগত সমাজধর্ম্মের আনুগত্য নিবন্ধন এসকল বামাচার বর্জ্জন করিয়া চলেন, তাঁহারাও এই লৌকিক সংস্কারবদ্ধ হইয়া, অশেষবিধ কল্পনা-জালে জড়াইয়া এই শুদ্ধা সাত্ত্বিকী ভক্তিপন্থাটিকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করিয়াছেন। আর চৈতন্যাবতার-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বটি বুঝিতে হয়, এবং এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, রাধাকৃষ্ণের লীলা-কথার সঙ্গে যেসকল কল্পনা ও কিম্বদন্তি জড়াইয়া গিয়াছে, সকলের আগে তাহাকে নিঃশেষে পরিষ্কার করিতে হয়।

অতএব সকলের আগে ইহা দৃঢ় করিয়া ধরিতে হইবে যে রাধাকৃষ্ণ দেবতা নহেন, রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি বা প্রতিমা নহেন, রাধাকৃষ্ণ রূপক নহেন, কবিকল্পনা নহেন;—রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ববস্তু। তত্ত্ববস্তু মাত্রেই জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু। জ্ঞান মাত্রেই অনুভূতিতে যাইয়া শেষ হয়। অর্থাৎ অনুভূতিতে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয় না,

তাহা পূর্ণ জ্ঞান নহে, তাহা অপূর্ণ, জ্ঞানাভাস মাত্র। অনুভূতি আমাদের আত্মার ধর্ম্ম। যে বস্তুকে আমরা আমি ও আমার বলি, শাস্ত্রে যাহাকে অহং বস্তু বলিয়াছেন, এই অস্মদপ্রত্যয়বাচক বস্তুই আমাদের আত্মা। এই আত্মা আমাদের অন্তরতর, অন্তরতম বস্তু। এই আত্মবস্তুর বা অহং বস্তুর আশ্রয়েই আমাদের যাবতীয় জ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই আত্মার মধ্যে যাহা নাই, আমরা কিছুতেই তাহাকে বাহির হইতে আনিয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্যভুক্ত করিতে পারি না। লৌকিক কথায় বলে "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে"। এই ভাণ্ডই আমাদের আত্মবস্তু। যাহা আত্মার মধ্যে নাই, বাহিরে আমরা কিছুতেই তাহাকে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা ধরিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড বলিতে এই বিষয়রাজ্য বুঝি। এসকল বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা এসকলকে আমরা আমাদের জ্ঞেয়রূপে লাভ করিয়াই, ইহারা যে আছে ইহা জানি। যাহা জানি না, তাহা আমাদের নিকটে নাই। তাহা যে আছে, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। যে জানে তার কাছে ইহা আছে ; আমরা জানি না আমাদের নিকটে ইহা নাই। আর যাহা আমাদের আত্মাতে নাই, বাহির হইতে আমরা তাহাকে জানিতে পারি না বলিয়াই, লোকে বলে—যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। ভিতরে যার সুরতাললয়ের জ্ঞান নাই, বাহিরেও সঙ্গীত বলিয়া কোনও কিছু তার নিকটে নাই। অন্তরে যার রূপের অনুভব নাই, যে জন্মান্ধ, বাহিরের রূপ তার নিকটে নাই। এই জন্যই পণ্ডিতেরা বলেন যে জ্ঞানমাত্রেই আত্মজ্ঞান। আত্মার আপনার অনুভূতিরূপেই যাবতীয় বিষয় আমাদের জ্ঞানগম্য হয়। আমি যখন বলি যে রামকে আমি জানি, তখন বাস্তবিক ইহাই বলিতে চাই যে আমি আমার নিজেকে রাম নামক ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞাতারূপে জানি। রামের রূপগুণাদি আমার নিজের ভিতরেই, আমার আত্মার ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আমি এসকল যে আমার ভিতরে

আছে, ইহা জানিতাম না। রামকে দেখিয়া সেই সকল আত্মধর্ম্মই আমার জ্ঞানেতে ফুটিয়া উঠিল। রাম তখন আর আমার বাহিরের বস্তু রহিল না। আমার জ্ঞেয়রূপে, আমার আত্মার মধ্যে লীন হইয়া, আমার সঙ্গে একাত্ম হইয়া, আমি যে তাহার জ্ঞাতা, এই অনুভব বা উপলব্ধি জন্মাইল। ইহাই জ্ঞানের সার্ব্বজনীন পথ।

রাধাকৃষ্ণ যখন তত্ত্ব বস্তু, জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, তখন এই পথেই এই তত্ত্বও আমাদের জ্ঞানেতে প্রকাশিত হইবে। ইহার ত আর অন্য পথ নাই। আর জ্ঞানবস্তু বলিয়া, এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আমাদের ভিতরের বস্তু, বাহিরের নহে। আমাদের আত্মজ্ঞানের মধ্যে, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে এই তত্ত্ববস্তু মিলিয়া, মিশিয়া, জড়িত হইয়া রহিয়াছে। এই আত্মা কোনও দেশেতে বা কোনও কালেতে আবদ্ধ নহে। এই আত্মা আপনার জ্ঞান-প্রয়োজনে আপনার মধ্যেই দেশ ও কালের প্রতিষ্ঠা করে। রাধাকৃষ্ণ যখন তত্ত্ববস্তু, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু; তখন ইহাও দেশকালের অতীত। দেশ-কালের সীমাতে ইহাকে আবদ্ধ করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো "অদ্বয়জ্ঞানবস্তু" বলিয়াছেন। অদ্বয়জ্ঞান বলিলেন এই জন্য যে আমাদের প্রাকৃত জ্ঞানেতে আমরা আপাততঃ যে বিষয়-বিষয়ীর বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের একটা ভেদ প্রতিষ্ঠা করি, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব-বস্তু, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানবস্তু হইলেও, তাঁহার মধ্যে এই ভেদ নাই। আত্মতত্ত্ব যেমন অখণ্ড, অদ্বৈত-তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব যেমন অখণ্ড অদ্বৈত তত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপ অখণ্ড, অদ্বৈততত্ত্ব। ব্রহ্মকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয় করিতে পারি না, কারণ আমাদের জ্ঞানের বিষয় মাত্রেই আমাদের জ্ঞাতৃত্বের অধীন হয়—আমাদের জ্ঞানের ছাঁচে পড়িয়া তবে আমাদের জ্ঞেয় হয়; কিন্তু ব্রহ্মবস্তু স্ব-তন্ত্র। ব্রহ্মতত্ত্বে আমাদের জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, আমাদের জ্ঞাতৃত্বের সম্ভব তাঁহা হইতে, এই তত্ত্ব আমাদের জ্ঞাতৃত্বের অধীন নহে। আর

ব্রহ্মকে যেমন জ্ঞানের বিষয় করা যায় না, এই তত্ত্ব যেমন জ্ঞানের বিষয়রূপে জানা যায় না, অপরোক্ষ অনুভূতিতেই কেবল জ্ঞাতা বা বিষয়ীরূপেই ইঁহার উপলব্ধি হয়, কৃষ্ণতত্ত্বও সেইরূপ। কৃষ্ণতত্ত্বকেও আমাদের জ্ঞাতৃত্বের আয়ত্তাধীনে আনা যায় না। জগতের বিবিধ বিষয়কে যেভাবে আমরা জানি সেভাবে ব্রহ্মতত্ত্বকে বা কৃষ্ণতত্ত্বকে জানা যায় না। ফলতঃ যাহা ব্রহ্ম, তাহাই শ্রীকৃষ্ণ। নামভেদ মাত্র, বস্তুভেদ নাই। উভয়ই অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর বিভিন্ন নাম মাত্র।

বদন্তিতত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

তত্ত্ববস্তু যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুকেই তত্ত্ব কহিয়া থাকেন। এই তত্ত্বকেই উপনিষদে ব্রহ্ম, যোগীজনেরা পরমাত্মা, আর ভাগবতেরা ভগবান বলিয়া থাকেন। আর এই ভগবানই শ্রীকৃষ্ণ। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" শ্রীরাধা এই শ্রীকৃষ্ণেরই চিৎ-শক্তি। শক্তি আর শক্তিমান ত দুই বস্তু নয়। শক্তি ও শক্তি-মান একই, অদ্বয়বস্তু। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেমন জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপিণী শ্রীরাধাও সেইরূপ জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু। শ্রীকৃষ্ণকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয়রূপে জানিতে পারি না, শ্রীরাধাকেও পারি না। আমাদের নিজেকে জানিতে যাইয়াই যেমন আমরা সাক্ষাৎভাবে, অপরোক্ষ অনুভূতিতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বা অদ্বয়জ্ঞানবস্তুরূপে জানি; শ্রীরাধাকেও সেইরূপ, এই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে, অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। এ বস্তুর জ্ঞান কোনও ইন্দ্রিয়সাহায্যে লাভ করা যায় না। শাস্ত্রাদি পড়িয়াও ইহার অনুভব হয় না। নিজের মধ্যে, আপনার আত্মার সঙ্গে, আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, সম্ভব ও প্রামাণ্যরূপেই এই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হয়।

এই তত্ত্বের উপলব্ধি লাভ করিতে হইলে, প্রথমে আত্মা কি আর অনাত্মা কি, এই বিচার করিতে হয়। এই দেহটা কি আমার

আত্মা ? আত্মা জ্ঞানবস্তু, দেহের ত নিজের জ্ঞান নিজে লাভ করিবার শক্তি নাই। দেহ যে আছে, ইহা আত্মার অধিষ্ঠানেতেই আমরা জানি। দেহকে আত্মার জ্ঞেয় বা বিষয়রূপেই আমরা জানিয়া থাকি। সুতরাং দেহ নিজে জ্ঞানবস্তু নহে, দেহটা আমাদের অস্মদ্‌প্রত্যয়বাচক অহং বস্তু বা আত্মবস্তু নহে। এ সকল ইন্দ্রিয়ই কি আত্মা ? তাহাই বা বলিব কি করিয়া ? চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের যন্ত্র বা করণ মাত্র, ইহারা নিজেরা নিজেকে জানেনা, ইহাদেরে তবে জ্ঞানবস্তু বলিব কেমন করিয়া ? ফলতঃ চক্ষু রূপ দেখে, কাণ শব্দ শোনে, রসনা রস আস্বাদন করে, এ সকল কথা যে বলি, তলাইয়া দেখিলে ইহা কেবল কথার কথা মাত্র বলিয়াই প্রত্যক্ষ করি। কারণ চক্ষুর অন্তরালে যতক্ষণ মন আসিয়া না দাঁড়ায়, ততক্ষণ ত চক্ষুর সঙ্গে রূপের সান্নিধ্য সত্বেও রূপের জ্ঞান জন্মায় না। আবার এই মনও ত আত্মা নহে, কারণ বুদ্ধি না হইলে মনের মন্তব্য সম্ভব হয় না। তার পর এই বুদ্ধিও স্বপ্রতিষ্ঠ নহে, বুদ্ধি অহংকারের অধীন, এই অহংকার বা empirical ego'র সান্নিধ্য ব্যতীত বুদ্ধি কিছুই বুঝে না। যাহাকে আমরা আত্মা বলি, অহং বলি, যাহা জ্ঞানগম্য জ্ঞানবস্তু, সেই আত্মতত্ত্ব এই অহঙ্কারতত্ত্বের বা empirical ego'রও উপরে। এই অহঙ্কারতত্ত্বকেও ছাড়াইয়া গেলে, তবে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়। আর ব্রহ্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্ব এই আত্মতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত বলিয়া, এই আত্মার সাক্ষাৎকারেই কেবল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও কৃষ্ণসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, কৃষ্ণতত্ত্বের পথেও আত্মানাত্মবিবেক প্রথম সাধন।

এই বিবেকের পথ ব্যতিরেকী পথ। ইহার সূত্র "নেতি" "নেতি" ইহা নয়, ইহা নয়। চক্ষে যে রূপ দেখে, তাহা কৃষ্ণরূপ নহে; কর্ণে যে শব্দ শোনে, তাহা তাঁর মুরলীধ্বনি বা শ্রীমুখের বাণী নহে; এই যে স্পর্শ ত্বক অনুভব করে, তাহা তাঁর স্পর্শ নহে; এ রসনায় যে রস আস্বাদন করে, তাহা তাঁর রস নহে।

চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে, পটে বা প্রস্তরে যেসকল মূর্ত্তি গঠিত হয়, তাহার এই কৃষ্ণরূপ নহে। মন এই জগতের দর্শনশ্রবণাদি হইতে যে সকল কল্পিত বস্তুর সৃষ্টি করিয়া, চিত্রের বা ভাস্কর্য্যের, কাব্যের বা কাহিনীর, নাট্যের বা সংগীতের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে, তাহাও এই কৃষ্ণরূপ নহে। এইভাবে সকল বাহ্য বিষয়কে, সকল কল্পনাজল্পনাকে, সকল অনুমান-উপমানকে অন্তর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, নিজ-স্বরূপে অবস্থিতিলাভ করিলে পরে, সেই গভীরতম অধ্যাত্মযোগের ভূমিতে যেমন ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্ম-তত্ত্ব, সেই রূপ রাধাকৃষ্ণতত্ত্বও প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাধক তখন আপনার মধ্যেই রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের ও নিত্যলীলার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আর এই সাক্ষাৎকার যাঁর লাভ হইয়াছে, তিনিই কেবল, আপনার অন্তরঙ্গ, অপরোক্ষ অনুভবের অনুবাদে কবিরাজ গোস্বামী যে শ্রীশ্রীচৈতন্যাবতার-তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন, তাহার সত্য অর্থ করিতে সমর্থ হন। এ অবতারতত্ত্ব বাহিরের কথা নহে; ঐতিহাসিক ঘটনা নহে; শারীরপ্রকাশ নহে; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; শ্রুতিলভ্য নহে। যে অপরোক্ষ অনুভূতিতে ইহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে, সে-ই কেবল ইহার মর্ম্ম জানে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

## রূপ

পুছিও না মোরে, সে কেমন জন, বলিতে নারিব আমি।
নয়ন দেখেছে, নয়ন না জানে, কেমন সে রূপখানি॥
সেরূপ পরশে, আঁধোয়া এ আঁখি, কে কারে দেখিবে বল?
কিবা সে বরণ, কিবা সে গঠন, (কেবল) মরম ছুঁইয়া গেল!
মরম ছুঁইয়া, পরাণে পশিয়া, সৃজিল আপন কায়।
পরাণ চিরিয়া, বাহির করিলে, দেখিতে পাইবে তায়॥
মিছা কহিলাম চিরিলে পরাণ, দেখা নাহি পাবে তার।
পিঞ্জর ভাঙ্গিবে, পাখী পালাইবে, ভাঙ্গা সুধু হবে সার॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

## সেকালের নবদ্বীপ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর নবদ্বীপ নগর বড়ই সমৃদ্ধিশালী ছিল। নবদ্বীপের মহিমা বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন:—

"নবদ্বীপ হেনগ্রাম ত্রিভুবনে নাই,
যাহে অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্ত গোঁসাই।
* * * *
নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিতে পারে,
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ,
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ।

সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে,
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপ যায়,
নবদ্বীপে পড়ি সেই বিদ্যারস পায়।
রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বৈসে,
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে। (চৈঃ ভাঃ—আদি)

কবি কর্ণপুরের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতের প্রথম প্রক্রমেও ইহারই অনুরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, কেবল ধর্ম্মকথার বাহুল্যে তথায় কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি যোগ আছে। চৈতন্য ভাগবতের অন্যত্র গৌরাঙ্গের নগর ভ্রমণের বর্ণনায় নবদ্বীপের সেকালের সমৃদ্ধির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কবির লক্ষ লক্ষ বাদ দিয়াও বুঝা যায় যে বিভিন্ন পল্লীতে নানা জাতীয় বহুলোক বসতি করিত এবং নানা শ্রেণীর মধ্যে সমবেদনার অভাব ছিল না। হাট ঘাট, রাজপথ ও অট্টালিকার পারিপাট্যের উল্লেখও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে 'সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম' আছে। পরবর্ত্তী কালে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাচার্য্যেরা নবদ্বীপের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থে বিষ্ণুপুরাণ হইতে এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপ কসেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্॥
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সম্বৃতঃ॥
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ॥

চক্রবর্ত্তী মহাশয় "ভারতবর্ষভেদে শ্রীনবদ্বীপ হয়। বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে নিরূপয়" বলিয়া শ্লোকের টীপ্পনিতে লিখিয়াছেন :—

"সাগরসম্ভূত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্ নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে"। নবম দ্বীপের পৃথক্ নাম লেখা হয় নাই বলিয়াই শেষ দ্বীপটি নবদ্বীপ, কেননা নামেও মিল আছে, ইহাই নির্গলিতার্থ। কথিত শ্লোকে যে ভারতবর্ষের নবমভাগের এক ভাগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় সেকথা মনে করেন নাই, এবং বঙ্গদেশমধ্যস্থ নবদ্বীপ গ্রামের অস্তিত্ব পুরাণবর্ণিত যুগে সম্ভব কি না তাহা অবশ্য তখন আলোচিত হইবার নহে। এইরূপে অগ্রদ্বীপও গোপীনাথের কল্যাণে প্রাচীনত্ব পাইতে পারে। চক্রবর্ত্তী কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন :— 'নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়, নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়'। অতঃপর নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিকে দ্বীপ কল্পনা করিয়া তাহাদের সংস্কৃত নামকরণ হইয়াছে, যথা সীমন্তদ্বীপ (সিমলা), গোদ্রুম (গাদিগাছা), মধ্যদ্বীপ (মাজিদা), কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ঋতুদ্বীপ (রাতু ও রাহুতপুর), মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, মাউগাছি), জহ্নুদ্বীপ (জাননগর), রুদ্রদ্বীপ (রাহুপুর), শেষ অর্থাৎ নবমটিকে অন্তর্দ্বীপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ইহারই মধ্যে মায়াপুর শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি। সেকালের ঘটকদের গ্রন্থে অন্যভাবে গঙ্গাগর্ভোত্থিত চক্রদ্বীপ, জয়দ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপের কথা আছে ; এই উক্তি কৃত্তিবাসের কথার সহিত মিলে। বৈষ্ণব লেখকেরা ক্রমে ব্রজলীলার অনুসরণে ভাগীরথীর উভয় তীরের ষোলক্রোশ বিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন পল্লীকে গৌড়লীলার 'বৃন্দাবন' ধরিয়া লইয়াছেন। অবশেষে প্রেমভক্তির প্রকোপে নদীয়ার বুড়ো শিব ও পোড়া মাকেও ব্রজের কালভৈরব ও যোগমায়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। যাহা হউক উক্ত দ্বীপ বা ধামগুলির সন্ধানে যাওয়ায় আমাদের বিশেষ লাভ নাই ; তবে সেকালের নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী কুলিয়া, বিদ্যানগর, জাননগর প্রভৃতি পল্লীরও যে যথেষ্ট শ্রী ছিল, তাহার পরিচয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাইতে পারি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে

তখন ভাগীরথী নবদ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তবাহিনী ছিলেন এবং পর-পারেই উক্ত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি স্থাপিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চার সমধিক উন্নতি লক্ষিত হয়। চৈতন্য ভাগবতে 'সবে মহা অধ্যাপক' উক্তির সহিত নানা দেশ হইতে বিদ্যার্থী আসার সংবাদ পাইতেছি। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে যে বিদ্যালাভের জন্য 'বড়গঙ্গাপাড়ে' যাইতে হইত একথা কৃত্তিবাসী রামায়ণের নবাবিষ্কৃত ভূমিকায় এবং বাসু-দেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতির মিথিলায় পাঠ শেষ করিবার কথায় পাওয়া যায়। যে নবদ্বীপ বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের গঙ্গাবাসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় পণ্ডিত সমাজের লীলাভূমি হইয়াছিল, যেখানে মহামনস্বী পশুপতি এবং হলায়ুধ প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের বেদো-জ্জ্বলা বুদ্ধিতে হিন্দুসূর্য্যের পাটে বসিবার সময়ে একবার রক্তসন্ধ্যা দেখা দিয়াছিল; যথায় 'ধোয়ী কবিঃ ক্ষ্মাপতিঃ' মেঘদূতের কনিষ্ঠ সহো-দর পবনদূতকে প্রেরণ করিয়া গৌড়জনের গৌরববার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া-ছেন; উমাপতি ধর বাক্য পল্লবিত করিয়া ভবিষ্যৎ বাকসর্ব্বস্ব বাঙ্গা-লীকে ভাষা ফেণাইবার আদর্শ দেখাইয়াছেন, সর্ব্বশেষ পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী অজেয় কবি জয়দেব শব্দজয়ের মরাগাঙ্গে সন্দর্ভ-শুদ্ধ ললিত ভাষায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ভাগীরথীও ভাসাইয়া তুলিয়াছেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেই নবদ্বীপের দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছিল। স্মৃতির স্মৃতি নবদ্বীপে যে এক-বারেই লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না; শূলপাণি নদীয়া অঞ্চলেরই লোক এবং দেশীয় প্রবাদ জীমূতবাহনকে নবদ্বীপেই টানিয়া লইয়াছে। তুর্কীদল নদীয়ার সারস্বত ভাণ্ডার লুণ্ঠন করে নাই বটে, কিন্তু নগর ধ্বংসের সহিত উহাও যে মাটিচাপা পড়িয়া-ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই শত বর্ষের প্রবল পাঠান-পীড়নে ম্রিয়মাণ বঙ্গীয় সমাজ রাজা গণেশের সময়ে চকিত মাত্র মাথা তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাজসভায় 'রায়মুকুট' উপাধিপ্রাপ্ত

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ অন্তর্থনামা বৃহস্পতি স্মৃতির নূতন নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের গ্রন্থে বৃহস্পতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন স্বয়ং বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীনাথ আচার্য্যের নিকট পাঠ শেষ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। গৌড়ের বাদশা হোসেন শার শান্তিময় শাসনের ফলে দেশে আবার শাস্ত্রচর্চ্চার সুবিধা হইয়াছিল; নবদ্বীপেও ক্রমশঃ অনেক পণ্ডিতের আবির্ভাব হইল। স্মৃতিশাস্ত্রে রঘুনন্দনের পিতা হরিহর বন্দ্যোও এক খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। বিশারদ ও অন্যান্য অনেক পণ্ডিত নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়াছিলেন।

### নবদ্বীপ সমাজ।

বিশারদ পণ্ডিতের পুত্র বাসুদেব মিথিলায় গিয়া মহামহোপাধ্যায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লইয়া দেশে ফিরিলেন। সেকালে সম্ভ্রম রাখিবার জন্য মিথিলার অধ্যাপক মহাশয়েরা পুঁথি নকল করিয়া লইতে দিতেন না; অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে দেশে ফিরিয়া বাসুদেব কয়েকখানি পুঁথি অবিকল লিখিয়া ফেলেন (১)। শুনা যায়, 'সার্ব্বভৌম নিরুক্তি' নামে তাঁহার এক ন্যায়ের টীকাও ছিল। বিদ্যানগরের চতুষ্পাটীতে দর্শন শিক্ষা দিয়া কিয়ৎকাল পরে তিনি উড়িষ্যায় রাজপণ্ডিত হইয়া যান; কিন্তু তাঁহার সহোদর বিদ্যাবাচস্পতি বাটীর টোল চালাইয়াছিলেন। বাসুদেবের সুযোগ্য ছাত্র মহামনস্বী রঘুনাথ পক্ষধরের নিকট পাঠ শেষ ও শিরোমণি উপাধি লাভ করিয়া আসিয়া নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের

---

(১) একালে কেহ কেহ রঘুনাথ শিরোমণিই ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসেন, এই অলীক প্রবাদ প্রচার করিতেছেন। কুশাগ্রধী শিরোমণি মুখস্থ করার ছেলে ছিলেন না। আমরা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে বাসুদেবের স্মৃতিশক্তির প্রবাদ শুনিয়াছি, এখনও ইহা চলিত আছে। সার্ব্বভৌম পুঁথি না আনিলে নব্য ন্যায়ের অধ্যাপনা চলিল কিরূপে ?

সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের যশঃ-সৌরভ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া সেকালের স্মৃতি ও দর্শনের ছাত্রদিগকে নবদ্বীপে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই কারণেই বৈষ্ণব কবি 'সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ' বলিয়া উল্লসিত হইয়াছেন। তখন হইতে পণ্ডিতের নবদ্বীপ বঙ্গে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

নবীন যুবক নিমাই পণ্ডিতও ( শ্রীগৌরাঙ্গ ) অল্পবয়সে নবদ্বীপেই পাঠ শেষ করিয়া ব্যাকরণের টোল খুলিয়া শব্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন। যৌবনে পাণ্ডিত্যগর্ব্বে তিনি যার তার সঙ্গে ফাঁকি তর্ক করিয়া বেড়াইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যাবত্তা বিষয়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শ্লোকে দোষ দর্শাইবার দৃষ্টান্ত দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন (২)। কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজের মধ্যে লালিত হইয়া গৌরাঙ্গের বিদ্যা যে কেবল ব্যাকরণ অলঙ্কারেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, ইহা পরবর্ত্তী ভক্তদিগের অসহ্য হইল। যে কাণ ভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি ধীশক্তির নিমিত্ত দেশপ্রসিদ্ধ, শ্রীচৈতন্যের বুদ্ধিবৃত্তি যে তাহা অপেক্ষাও প্রখরা, তিনি যে 'সব বিষয়ে সবার সেরা' এরূপ না দেখাইতে পারিলে যুগাবতারের সম্মান কোথায়? ক্রমশঃ প্রচারিত দুই একটি গল্পে শ্রীগৌরাঙ্গকে শিরো-

---

(২) চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃত।

'ব্যাকরণী তুমি নাহি পড় অলঙ্কার, তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার'—চরিতামৃত। চরিতামৃতের কোন টীকাকার এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে 'কেশব কাশ্মিরী' ধরিয়া লইয়া এই বিষয়টির গুরুত্ব সমধিক বৰ্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়াছেন। নিম্বকি মতাবলম্বী কেশব কাশ্মিরী কবি নহেন। চৈতন্যদেব তর্কে যে দর্শন জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা-প্রসূত। তিনি যে পরে শুষ্ক জ্ঞানবাদীদিগকে ভক্তিমার্গে প্রণোদিত করিয়াছেন, ইহা যাঁহারা বিদ্যার জোরে বলিতে চান, তাঁহাদিগকে একালের রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের দৃষ্টান্ত মনে রাখিতে বলি।

মণিরও শিরোমণি করা হইয়াছে। (প্রথম) রঘুনাথ একদিন গাছ-তলায় বসিয়া এক অতি জটিল প্রশ্নের সমাধানে সমাহিতচিত্ত আছেন, পৃষ্ঠদেশে কাকে মলত্যাগ করিয়াছে, জ্ঞান নাই; এমন সময়ে নিমাই পণ্ডিত স্নান করিয়া ফিরিতেছেন, বালক নিমাইএর স্নানের ঘাটে উৎপাতের কথা বাল্যলীলাপ্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিয়াছেন। তাহারই উপসংহারে গল্প-রচয়িতা বলিতেছেন :—রহস্তপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত ভিজা কাপড় নিঙড়াইয়া রঘুনাথের পৃষ্ঠে জল দেওয়ায় তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—'কিহে নিমাই, ব্যাপার কি?' নি—'পিঠে কাকে যে বাহ্যে করেছে?' রঘু—'পড়াশুনা করতে হলে মনঃসংযোগ চাই, তোমার মত ভেসে ভেসে বেড়ালে চলে না।' চিন্তার বিষয়টা কি জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ যে সমস্তার আলোচনা করিতেছিলেন তাহাতে ছয় প্রকার পূর্ব্ব পক্ষ এবং সেই সমস্তের যথাযথ মীমাংসা শুনাইয়া অবশেষে যে আপত্তি উঠিতে পারে তাহা জ্ঞাপন করিলে গৌরচন্দ্র অণুমাত্র চিন্তা না করিয়াই তাহার সদুত্তর দিলেন।

(দ্বিতীয়) এক সময়ে রঘুনাথ ও নিমাই একসঙ্গে খেয়ার নৌকায় গঙ্গাপার হইতেছিলেন। বগলে কি পুঁথি জিজ্ঞাসায় নিমাই উত্তর দিলেন, তাঁহার স্বরচিত স্থায়ের টীকা। রঘুনাথ তাহা একবার দেখিয়া লইয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, "এই স্থায়ের টীকা প্রচারিত হইলে আমার টীকার আর কিছুই আদর হইবে না।" রঘুনাথের দুঃখ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ তৎক্ষণাৎ ঐ পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন, ইতি। গঙ্গাজলে পুঁথি ফেলিয়া দেওয়ার গল্পটি ঈশান দাসের (নাগর) অদ্বৈতপ্রকাশে দেখা দিয়াছে। তখন শ্রীচৈতন্য অবতার বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু ঐ পুস্তকেও রঘুনাথ শিরোমণির নাম নাই, কোন এক পণ্ডিতের প্রসঙ্গে উহা কথিত হইয়াছে। এই স্বার্থ-বিসর্জ্জনের গাল-গল্পের সমালোচনা বৃথা। অবশ্য শ্রীচৈতন্য-চরিত স্বার্থত্যাগের সুন্দর আদর্শ বটে, এবং শিশির বাবুর মত

ভক্ত ব্যক্তি 'অফল শাস্ত্র টানিয়া ফেলাইতে' পারিলেও পারেন। কিন্তু একখানি মূল্যবান গ্রন্থের বিনাশে জগতের যে ক্ষতি, তাহাতে স্বার্থ কোন্ দিকে কে তাহার মীমাংসা করে? কেহ কেহ কথিত স্থায়ের টীকা রঘুনাথের প্রথম বয়সের লেখা বলিয়া গোল মিটাইতে চান।

এখন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক নবদ্বীপ-সমাজের শিক্ষা দীক্ষার কথা আর কি জানা যায় দেখা যাউক। বিশ্বম্ভর ওরফে নিমাই উপনয়নান্তে 'ত্রিকচ্ছ বসন' পরিয়া গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ব্যাকরণের টোলে পড়িতে যান। তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা শুনিয়া গুরু বড়ই তুষ্ট হইলেন:—

গুরু বলে বাপ তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দৃঢ় ॥

* * * *

আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন,
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।

ইহাতে সেকালের শিক্ষার প্রণালীর কথাও পাইতেছি। নোট্ লিখাইয়া দিয়া বা প্রাত্যহিক পরীক্ষা সহযোগে তথনকার পাঠনা হইত না। গঙ্গাদাসের সভায় বা টোলে 'পক্ষ প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায়,' তখন ষোড়শ বর্ষ মাত্র বয়স। 'যোগপট্ট ছাঁদে বস্ত্র করিয়া বন্ধন, বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন' এই হইল বসিবার প্রণালী। মুরারী গুপ্ত 'স্বতন্ত্রয়ে পুঁথি চিন্তে', তাঁহার নিকট প্রশ্ন করে না, দেখিয়া নিমাই বলিলেন, 'ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি, কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি।' গুপ্তের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া অন্যরূপে বুঝাইয়া দিলে মুরারী বলিল, 'চিন্তিব তোমার স্থানে শুন-বিশ্বম্ভর।' মুকুন্দ পণ্ডিতের বাড়ীতে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, তাহাতে 'বিস্তর পড়ুয়া ধরে।' গোষ্ঠী করিয়া নিমাই সেখানে অধ্যাপনা করেন, এবং 'হেন জন দেখি ফাঁকি বলুক আমার,' তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী

তাহার' বলিয়া আস্ফালন করেন। এইরূপে 'বিদ্যারসরঙ্গে' গৌরাঙ্গ কিছুদিন ফাঁকি তর্ক করিয়া বেড়াইলেন। 'ব্যাকরণ শাস্ত্র সবে বিদ্যার আদান; ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণজ্ঞান,' অলঙ্কার বিচারেও ঐ প্রকার। একদিন ন্যায়ের পড়ুয়া গদাধরকে ধরিয়া "মুক্তির প্রকাশ, আত্যন্তিক দুঃখনাশ" এই উক্তি ও 'নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতী পতি।' শেষে লোকে ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে তাঁহার নিকট ঘেঁসে না। 'উদ্ধতের চূড়ামণি' বলিয়া তাঁহার খ্যাতি তখন নবদ্বীপে প্রচারিত; স্নানের ঘাটেও অন্য ছেলেদের জোটাইয়া তিনি কত উৎপাত করেন। অবশ্য দাস ঠাকুর কৈশোর-লীলাপ্রসঙ্গেই এই সকল উত্থাপন করিয়াছেন; কৃষ্ণলীলার সহিত কতকটা সঙ্গতি রাখা ত চাই।

মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে চণ্ডীমণ্ডপে টোল করায় নিমাই পণ্ডিত রীতিমত অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন; তৎপূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত টোলে পাঠনা, পরে গঙ্গার ঘাটে জলক্রীড়া, বৈকালে ভ্রমণের সময়ে 'গঙ্গাতীরে শিষ্যসঙ্গে মণ্ডলী করিয়া' বসিয়া পাঠাদির আলোচনা, এইরূপে দিবা অতিবাহিত হইত। সেকালের পড়ুয়াদেরও ক্লব কমিটী ছিল।

> যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিত সমাজ,
> কোটার্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্র সাজ।
> ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য,
> অধ্যাপনা বিনা কার আর নাহি কার্য্য।
> যদ্যপিও সবেই স্বতন্ত্র সবে জয়ী,
> শাস্ত্রচর্চ্চা হইলে ব্রহ্মারও নাহি সহি। (বৈঃ ভাগবত)

তথাপি প্রভুর প্রতি 'দ্বিরুক্তি করিতে কার নাহিক শকতি' এই বলিয়া কবি দিগ্বিজয়ী বিজয়োপাখ্যানের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিদ্যাচর্চ্চার উপসংহার করিয়াছেন। কবিকল্পিত 'কোটার্ব্বুদ' বাদ দিয়াও আমরা নবদ্বীপের অধ্যাপক সমাজের সেকালের প্রতিষ্ঠার কথা অনুমান করিতে পারি।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম শেষ বয়সে উৎকল রাজের আমন্ত্রণে তথায় সভা-পণ্ডিতের কার্য্য স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন; ভাগবত পাঠের সহিত দ্বিতীয় বর্গের চিন্তাও ছিল কি না, কে বলিবে; (৩) কিন্তু,

সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহাভাগ্যবান্

বিদ্যানগরের বিদ্যাচর্চ্চা হীনপ্রভ হইতে দেন নাই। ভবিষ্যৎ সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি এই বিদ্যাবাচস্পতির ছাত্র। সে সময়ে সার্ব্বভৌমের শিষ্য রঘুনাথের প্রভায় নবদ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের সর্ব্বভূমিও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কথা পরে বলিব।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৩) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত মুসলমানের অত্যাচারে 'বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য; সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য' কথায় সন্দেহ হয়; ইহা বারান্তরে আলোচ্য।

# মাথুর

১

বঁধু যাবে মধুপুরে নিশি হ'লে অবসান
বিঁধি বিনোদিনী-বুকে দারুণ বিরহ-বাণ,—
কে হেন নিঠুর প্রাণী          এমন কঠিন বাণী
কহিবে সখীরে আজি, ভাঙ্গিবে কোমল প্রাণ?
শুনিলে, বুঝি বা বালা গরল করিবে পান!

২

নিশি না পোহাতে বালা পাতিয়া থাকিত কান,
কখন বাজিবে শিঙা, রাখাল গায়িবে গান।
শুনিলে শিঙার ধ্বনি          চমকি চাহিত ধনী
বাতায়নে সঙ্গোপনে, পিপাসিত দুনয়ান
হেরিতে বঁধুর মুখ—উষার প্রথম দান!

৩

দিবসে গৃহের কাজে নিরত রহিলে কর,
বিভোর রহিত হিয়া বঁধু-প্রেমে নিরন্তর।
ক্ষণে ক্ষণে কি স্বপনে          চমকি উঠিত মনে,
দেখিত বঁধুর ছায়া, শুনিত বঁধুর স্বর,
সহসা পুলকভরে শিহরিত কলেবর!

৪

তরুর দীঘল ছায়া পড়িলে অঙ্গনে তার,
ছুটিত যমুনা-জলে লইয়া কলস-ভার।
গোঠ হ'তে ক্লান্ত যবে          ফিরিত রাখাল সবে,
আড়ালে দেখিত বালা মুখ-বিধু বঁধুয়ার,
লুকালে, পথের ধূলি চুমিত সে বার বার।

৫

গুরুজন পাশে বসি' শুনিয়া বাঁশীর গান,
আবেগ লুকাতে গিয়া আবেশে বিবশ প্রাণ।
বঁধুর মিলন-সুখে হার না পরিত বুকে;
ঘুমালে, বঁধুরে ঘুমে দোয়াথি করিতে দান
পয়োধরে পদ চাপি' নিশি হ'ত অবসান।

৬

এমন গভীর মরি বঁধুর পিরীতি যার,
সে কেমনে বঁধু বিনে বহিবে জীবন-ভার?
বৃন্দা কহে—"লো বিশখা! নিঠুর হবে কি সখা?
দলিতে চরণ-লতা ব্যথা কি পাবে না আর?
চল্ যাই, পায়ে ধরি' হৃদয় ফিরাই তার।"

৭

বিশখা কহিছে বাণী—"তারে কে বুঝাবে বল্?
পরের পরাণ ল'য়ে খেলা করা তার ছল!
নিজে না পিরীতি করে, পর সে পিরীতে মরে,
তাহার সোহাগ শুধু সুধামাখা হলাহল,
তাহারে বাসিলে ভাল সম্বল নয়নজল!"

৮

সহসা দেখিল সবে—পিছনে দাঁড়ায়ে রাই,
চোখে জল, ওষ্ঠে হাসি, বদনে বিষাদ নাই!
কহিল—"দূষ না তাঁরে আমি ভালবাসি যাঁরে,
এমন গভীর প্রেমে বিরহের নাহি ঠাঁই,
জীবন মরণ দিয়ে বঁধুরে পূজিতে চাই।"

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

# শিল্পী

১

সভায় আসিয়া রাজা ডাকিলেন, "মন্ত্রী!"

মন্ত্রী দেখিলেন সুরটা ঠিক বাজিল না, স্বরে একটা কিছু গোলমাল আছে। করজোড়ে কহিলেন, "মহারাজ!"

রাজা বলিলেন, "রাজশিল্পীকে যে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে, তিনি কোথায়?"

মন্ত্রী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিদূষক বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, শিল্পী মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্‌তেই আজকাল দিন শেষ হ'য়ে যায়—আর লোকপরম্পরায় শুন্‌চি—"

রাজা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ কর। এ সময় ঠাট্টা শোভা পায় না।" এই বলিয়া মন্ত্রীর দিকে চাহিলেন। দৃষ্টিটা কিছু তীব্র।

অপ্রস্তুতভাবে মন্ত্রী কহিলেন, "আজ্ঞে তাঁরে ত দেখ্‌ছিনে। আমি এখনি তাঁর কাছে লোক পাঠাচ্ছি।

রাজা বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "তুমি নিজে যাও—লোক পাঠাতে হবে না।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।—অল্পদূরে গিয়াই দেখিলেন, শিল্পী সভার দিকে আসিতেছেন। মন্ত্রী ছুটিয়া গিয়া রাজার কথা তাঁহাকে জানাইলেন।

সভায় আসিয়া শিল্পী কহিলেন, "মহারাজ, এ অধীনকে স্মরণ করেছেন?"

রাজা বলিলেন, "হ্যাঁ তোমাকে ডেকেছিলুম। একটা বিশেষ কাজের কথা আছে।"

শিল্পী করজোড়ে কহিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিতে লাগিলেন, "দেখ শিল্পি, সেদিন রাণী তাঁর সখী দক্ষিণরাজমহিষীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়াছিলেন। সেখানে রাণীর সঙ্গে তাঁর ছবির সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। কথায় কথায় রাণী তোমার ছবি আঁকার খুব প্রশংসা করছিলেন। দক্ষিণরাজপত্নী সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে রাণীকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা ছবি দেখিয়ে বল্লেন, 'এই ছবিটার মতন কোন ছবি দেখেছ কি?' রাণী সেই ছবি দেখে একেবারে মোহিত। তিনি বল্লেন, 'না এরকম ছবি আমি কোথাও দেখিনি।' রাণী কাল প্রাসাদে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি বলছেন যে, তোমাকে এমন একটা ছবি এঁকে দিতে হবে যে, সেই ছবিটাকে হার মানায়। বুঝলে? রাণীর এই আজ্ঞা।"

চিত্রকর বিনীতভাবে কহিলেন, "আমি সে ছবি দেখেছি মহারাজ, তার সমান ছবিও যে আমি আঁকতে পারব সে ক্ষমতা আমার নাই।"

উত্তেজিত স্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু আমি বলছি তোমাকে পারতেই হবে। রাণীর সখী তিনদিন পরে এখানে নিম-ন্ত্রণে আসছেন। সেদিন তাঁ'কে ঐ ছবি দেখাতে হবে। এখন আমার মানসম্ভ্রম সব তোমার হাতে।"

শিল্পী নতমুখে কহিলেন, "মহারাজ, তিনদিনে আমি কি তা' পারব?"

"সে আমি শুনতে চাইনে। তিন দিন সময়।" এই বলিয়া রাজা আসন ছাড়িয়া উঠিলেন।

বিদূষক একটু কাশিয়া লইলেন। সেটুকুর অর্থ, "ইনিই আবার রাজশিল্পী!"

শিল্পী চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন সকলেরই মুখে ঘৃণার ভাব। ঊর্দ্ধে জালায়নের ভিতর দিয়া নূপুর ও বলয়ের মিশ্রিত ধ্বনি শিল্পীর

কানে আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু তাহা মিঠা লাগিল না; মনে হইল যেন উপহাস করিতেছে।

২

শিল্পী শূন্য বাসগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ আজ অত্যন্ত গম্ভীর। কানন অতিক্রম করিয়া ভারাক্রান্ত মনে শিল্পী ধীরে ধীরে গৃহসম্মুখস্থিত মর্ম্মর-বেদীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নববসন্তের বাতাস মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া নগরের গৃহে গৃহে ফিরিতেছিল। তাহা শিল্পীকে ক্ষণেকের জন্য বিচলিত করিল মাত্র; কিন্তু শিল্পী আজ নিরানন্দ। হৃদয়ের ভারে শিল্পী বেদীর উপর বসিয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, তিন দিনের মধ্যে চিত্র সমাপ্ত করিয়া দিতে হইবে। হায়, তিনি কি করিবেন, কি আঁকিবেন?

ইতিমধ্যে রাজা আদেশ দিয়াছেন তিন দিন শিল্পীর সঙ্গে কেহ দেখা করিতে পারিবে না।

শিল্পী ভারাক্রান্ত মনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেবি, ভক্তকে রক্ষা কর, এ সঙ্কটের হাত থেকে তুমি রক্ষা কর!"

নূপুর বাজিল। ফুলের গন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিল। শিল্পী অপূর্ব্ব ছায়া-প্রতিমা সম্মুখে দেখিলেন। কানে শুনিলেন, "শিল্পী তুমি তোমার নিজের মূর্ত্তি আঁক।"

শিল্পী ভাষা শুনিলেন কি সঙ্গীতের ঝঙ্কার শুনিলেন, ঠিক করিতে পারিলেন না। কেবল কানে রহিয়া গেল "শিল্পী তোমার নিজের মূর্ত্তি আঁক।"

"তাই আঁকব—আমি নিজের মূর্ত্তিই আঁকব" বলিয়া উন্মত্ত-প্রায় শিল্পী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘর হইতে আঁকিবার সরঞ্জামগুলি বাহির করিয়া আনিলেন।

শিল্পী তুলি লইয়া বসিয়া গেলেন। একমনে।

৩

সহসা রাজা শুনিলেন, শিল্পী নাই! শিল্পী নাই! সভাসদেরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া বসিয়া আছে। শিল্পী নাই!

মন্ত্রী সভয়ে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, রাজশিল্পীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

রাজা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পাওয়া যাচ্ছে না? সে আমি শুন্‌তে চাইনে। মন্ত্রী, তুমি তাঁকে যেখান থেকে পার খুঁজে নিয়ে এস। নইলে—"। ক্রোধে রাজার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল।

মন্ত্রী ভয়ে ভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আমি ত চারিদিকে লোক পাঠিয়েছি। তা'রা সকলে ফিরে এসে বল্‌ছে তাঁ'কে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি কোথাও নেই।"

"কোথাও নেই! মন্ত্রী, তুমি জান, তাঁর হাতে আমার সমস্ত মান সম্ভ্রম নির্ভর কর্‌ছে? তুমি চারিদিকে আবার লোক পাঠাও। আমি নিজে শিল্পীর বাড়ী যাচ্ছি।"

চারিদিকে আবার লোক ছুটিল।

রাজা স্বয়ং শিল্পীর গৃহদ্বারে উপস্থিত। চারিধার নিস্তব্ধ, কোথাও একটুও সাড়াশব্দ নাই। রাজা দেখিলেন, মর্ম্মর-বেদীর উপরে তুলি ও বর্ণপাত্র পড়িয়া আছে, কিন্তু শিল্পী নাই।

রাজা পাগলের মতন এঘর ওঘর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি ঘরে প্রবেশ করিয়া রাজা আবার দুই হাত পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন।

একি! একি চিত্র, না এ সত্য? একি রঙের খেলা, না প্রাণের?

রাজা নির্নিমেষনয়নে চিত্রফলকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দূত আসিয়া খবর দিল, "মহারাজ, রাজশিল্পীকে কোথাও পাওয়া গেল না।"

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

# বুড়ার অ্যালবাম

[ ১ ]

বৃদ্ধের সম্বল কি তোমরা কেহ জাননা বোধ হয়। একে একে বৃদ্ধের নিকট হইতে যখন সকলেই সরিয়া যায়, শৈশবের সরলতা, যৌবনের উৎসাহ, আশা, ভরসা, এমনকি প্রাণাধিক আত্মীয়-স্বজন সকলেই চলিয়া যায়, তখন থাকে কি? থাকে কে? থাকে তাহার লোল, কম্প্র জরাজীর্ণ দেহ-যষ্টিখানি—'আমি' আর আমার লোহার সিন্ধুক। 'আমি' কে জান কি? আমি তোমাদের সেই নির্জ্জন সঙ্গিনী, আনন্দ ও দুঃখ-সুখবিধায়িনী ত্রিকাল-চিত্রকরী শ্রীমতী স্মৃতি। আমারই লোহার সিন্ধুকটি বুড়ার সম্বল। বৃদ্ধের যা কিছু সম্বল উহার মধ্যেই সঞ্চিত। এবং ইহাই তাহার নীরস দীর্ঘ দিবস যাপনের চিত্তবিশ্রাম। আমিই তাহার তন্দ্রাহীন রজনীর শয্যা-সঙ্গিনী। বৃদ্ধ ইহাকেই আগুলিয়া বসিয়া থাকে; দিনের মধ্যে শতবার খোলে ও দেখিয়া তৃপ্ত হয়। কাহাকেও দেখাইতে চায় না। তোমরা কি দেখিতে চাও? তবে এস আমি দেখাইব। তোমাদের বিচরণ-ক্ষেত্র মহার্ঘ, বিচিত্র শ্যাম-গালিচামণ্ডিত; তোমাদের দিক্ চক্রবাল নবসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত। তোমাদের রত্নমণ্ডিত অ্যালবাম জগতের সুন্দর সুন্দর দেশ বিদেশের উৎকৃষ্ট চিত্রে সুশোভিত। বুড়ার অ্যালবাম দেখিতে ভাল লাগিবে কি? যাই হ'ক দেখিতে যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন দেখ।

প্রথম চিত্রে ঐ দেখ হংসকারণ্ডবসমাকুল, স্বচ্ছ দর্পণতুল্য বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। চতুষ্পার্শে আম, জাম, রসাল, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি ফলভরে অবনত। পশ্চিমে বাঁশ-বন সমীরে আন্দো-লিত হইয়া কখনও আকাশ, কখনও ভূমি চুম্বন করিয়া উঠিতেছে

পড়িতেছে। খেজুরের স্কন্ধদেশে সারি সারি মৃত্তিকা কলসগুলি বাঁধা রহিয়াছে। বুলবুলির ঝাঁক ভিড় করিয়া কলসনিহিত রসাস্বাদনে ব্যগ্র। হরিদ্রা বর্ণের বেনে বউগুলি মধুর স্বরে গান করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া উড়িয়া বসিতেছে। কুলবধূরা নাসিকা অবধি ঘোমটা টানিয়া জলে আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া মৃদু মৃদু রসালাপ করিতে করিতে তনুলতা মার্জ্জিত করিতেছে। প্রাচীনারা স্নানান্তে আর্দ্র বসনে ধৌত সোপানে সন্ধ্যাহ্নিকে নিমগ্না। ঘাটের এক পার্শ্বে মৃত্তিকার উপর বসিয়া, মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া, কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঘস্ ঘস্ করিয়া বাসন মাজিতে মাজিতে ঝীয়েরা কোন্দল বাঁধাইয়া দিয়াছে। মার্জ্জনার চোটে হাতের বাসন যেমন উজ্জ্বল হইতেছে ঝগড়ার দাপটে গলার স্বরও তেমনি ক্রমে সপ্তমে উঠিতেছে। চাকরেরা পিত্তলের কলস স্কন্ধে লইয়া ঘাটের দ্বার-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "ঘাটে যাবো গো?" বলিয়া আদেশের অপেক্ষা করিবার কালে গোপনে সরোবর-রহস্য দেখিয়া লইতেছে। ঐ দেখ বড় উঠানের এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড মরাই সোনার ধান বুকে ধরিয়া গৌরবে শির উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অপর দিকে রান্নাঘরের চালের মাথা দিয়া ধূম উত্থিত হইতেছে, যেন নীলগিরি শ্রেণীতে কুজ্ঝটিকার সমাবেশ হইয়াছে। বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ গোময় লেপিত হইয়া পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। রান্নাঘরের দাওয়ার উপর পিতলের গামলা, কাঠের পিঁড়ী, বড় বড় বঁটি, তরকারীর চাঙ্গারী, বউ ঠাকুরাণীদের সুগোল বলয়শোভিত, সাংঘাতিক কোমল করস্পর্শের অপেক্ষা করিতেছে। একদিকে গোল হইয়া বসিয়া ছোট ছোট বালকবালিকারা বাসী লুচি-সন্দেশের সদ্ব্যবহারে নিমগ্ন। বিড়াল শাবকগুলি সকরুণ "মিউ-মিউ" স্বরে চক্ষু মুদিয়া ডাকিতেছে, আর ছোট ছোট হাতের মৃদু চাপড় খাইয়া এক একবার পিছু হঠিতেছে। ঠাকুরঘরে গোপাল জিউ বিগ্রহের নিত্য পূজা আরম্ভ হইয়াছে। রূপার সিংহাসনের উপর গোপাল বসিয়া আছেন; হাতে বালা,

মাথায় চূড়া, গলায় তক্তি, কণ্ঠমালা, কোমরে বোর। গোপালের হাসিমুখ; হাতে সোনার বাটীতে মাখন। গোপালের ঘরের পার্শ্বের ঘরে ঘোলমওয়া চলিতেছে, তাহার মৃদু মধুর শব্দ উঠিয়াছে। সম্মুখের দালানে নগ্নপদে বাটীর কর্ত্তারা ও যুবকেরা বিগ্রহের আরতি দেখিতেছেন। বালকেরা ছোট ছোট হাত দুলাইয়া রূপার চামর ব্যজন করিতেছে। ঠাকুরঘরের চাকর কাঁসায় ঘড়ী পিটিতেছে। পুর-মহিলারা স্নাত হইয়া ঠাকুরঘরের মধ্যে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নন্দ-কিশোরকে দর্শন করিতেছেন। ঐ দেখ, সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ ভট্যাচার্য্য তিলক ও মাল্যচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বাহিরের একটি ঘরে সতরঞ্চের উপর কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রী লইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত। কাহাকেও চাণক্যের শ্লোক, কাহাকেও বা মুগ্ধবোধের সহর্ণের ঘঃ বুঝাইতেছেন। দুর্গাবাড়ীর সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের আটচালায় পাঠশালা বসিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তালপাতার গোছা জড়াইয়া, মাটির দোয়াত, খাঁকের কলম লইয়া বেত্রধারী গুরুমহাশয়ের নিকটে ভীত-চিত্তে উপস্থিত হইতেছে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক বালকেরা, কড়ানে, গণ্ডাকে, সিরকে, পুণকে চীৎকার করিয়া সুর তুলিয়া মুখস্থ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে সহপাঠীর কোঁচড়ের মুড়ীর মোওয়ার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। আরও দেখ বাহিরের ফটকস্থ সম্মুখের ময়দানে ভীমদর্শন দ্বারবানেরা মোচ মুচড়াইয়া কানের পাশে তুলিয়া দিয়াছে; রক্তচন্দনের রেখায় বাহু ও ললাট অঙ্কিত করিয়া গেরুয়া মালকোচা বাঁধিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া কেহ কুস্তী করিতেছে, কেহ মুগুর ভাঁজিতেছে, কেহ বা সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দেউড়ীর মধ্যে ঢাল তরবারি শোভা পাইতেছে। বৈঠকখানার নিম্নে দেউড়ীর পাশের ঘরে কাছারী বসিয়াছে। কর্ত্তা মছলন্দের উপর তাকিয়া হেলান দিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে শটকা টানিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণে বিস্তৃত গালিচার উপর লম্বিতশিখা নামাবলীধারী ন্যায়রত্ন, তর্কালঙ্কার, বিদ্যাবাগীশের দল শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত। সম্মুখে

নস্যের ডিবা। বাম দিকে পারিষদবর্গ; ঘোষজা, বোসজা, মিত্রজা প্রভৃতি; খোসগল্পে রত। সম্মুখে দেওয়ানজী, গোমস্তা নায়েবাদি নাকে চশমা, কানে কলম, সম্মুখে দপ্তর, হিসাব নিকাশে ব্যস্ত। কাছারীর বাহিরের রোয়াক ও প্রাঙ্গণে, পাইক, মোড়ল, প্রকৃতি-বর্গ, পিতৃদায়, কন্যাদায়গ্রস্ত গরীব লোকের ভিড়।

দ্বিতীয় চিত্রে দেখ—স্বর্ণাম্বরী, তপ্তকাঞ্চনবরণী, অম্বুজনয়না, বিমল জ্যোৎস্না-হাসিনী শরৎসুন্দরী পথে পথে শারদার আগমন সূচিত করিয়া দিতেছে। কাশ-বালকগুলি যেন শুভ্র পতাকা হস্তে ধরিয়া পথের ধারে ধারে দণ্ডায়মান। দেবীর চরণস্পর্শ লাভার্থ ব্যগ্র হইয়াই যেন কমলবনগুলি এক কালে দীর্ঘিকা আচ্ছন্ন করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কোমল সুমিষ্ট গন্ধে দিকসকল আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। পল্লী-বালকবালিকারা কোমল মৃণাল তুলিয়া কেহ মালা গাঁথিয়া গলায় পরিতেছে; কেহবা উহা ভক্ষণে রত হইয়াছে। পূজার বাটী সহসা অমল ধবল কান্তি ধারণ করিয়া হাসিতেছে। ঘেরাটোপরূপী ঘেরকা বা অবগুণ্ঠনমুক্ত হইয়া ঝাড়-লণ্ঠনরূপিণী সচ্ছাঙ্গিনীরা সর্ব্বাঙ্গ মাজিয়া ঘসিয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রিয় সমাগমের আশায় শুভ রাত্রির অপেক্ষা করিয়া ঐ দেখ মহা উল্লাসে, দুলিতেছে, ঝুলিতেছে, টুং-টুং ঠুং-ঠুং চিক্-মিক্ ঝিক্-মিক্ করিতেছে এবং ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণের শাড়ী পরিয়াছে। ওদিকে খই-মুড়কীর ঘরে বৃহৎ বৃহৎ হোগলার ডোলের মধ্যে মুড়কীর নারিকেল-লাড়ুর গন্ধমাদন স্থাপিত হইতেছে। ভিয়ান-বাড়ীতে তিভুড়ী কাটা ও কাঠ চালা হইতেছে। ছিষ্টে (সৃষ্টিধর) বাড়ীর শ্যাকরা "হার কই, মাকড়ী কই, তাগা কই, আংটী কই, কবে আর হবে" প্রভৃতি বউ ঠাকুরাণীদের তাগাদায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ঐ দেখ আজ পূজার ষষ্ঠী, পূজার দালান আলোকে পুলকে গন্ধে আনন্দে ভরপুর বধূমাতা ও কন্যাকাগণে পরিবেষ্টিতা গৃহিণী, করে রতনচূড় পরিধান করিয়া, মাথায় বরণডালা ধারণ করিয়া প্রতিমা

প্রদক্ষিণ করিতেছেন ; বধূযাতায়া অলক্তকরঞ্জিত চরণে মুখর নূপুর পরিধান করিয়া গৃহিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্ত্তন করিতেছেন ; হাতে হাত-ঝুম্‌কাগুলি দুলিয়া দুলিয়া ঝুণ ঝুণ করিয়া বাজিতেছে। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর সানাই আর বালকবালিকার কলকণ্ঠে পূজাবাড়ী মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে ; রঙ্‌ বেরঙের শাটীর তরঙ্গে বরাঙ্গে মেঘ-ডম্বর-অম্বরের মধ্য দিয়া কনক-নিকষ-বিদ্যুৎ-দীপ্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগিরিন্দ্রমোহিনী দাসী।

---

# পূর্ব্ব রাগ

১

[ নায়িকা পক্ষে ]

সখি ! কি আর কহিব তোরে !
আপনি না বুঝি আপন বেদন
পরাণ কেন যে এমন করে ॥

( আমি ) জানি না এ হিয়া কিসের লাগিয়া
সদাই অধীর হইয়া ছুটে।
চিনে না যাহারে স্মরিয়া তারে
কেনে গো গুমরি গুমরি উঠে ॥

শুধাইলি যদি, শোন্‌ তবে বলি
কেন যে আমার এমন ভেল।

দুটি আঁখি দিয়া, জড়াইয়া মোরে
কেমনে মরমে বিঁধিল শেল ॥

* * *

(একদিন) বসন্ত দুপরে আঙ্গিনার ধারে
বসিয়া বকুল-ছায়।
অপরূপ রূপ লাগিনু আঁকিতে
যেমন পরাণে ভায় ॥

মাথার উপরে দুলিল মাধবী,
আকুল ভোমরাকুল ;
সমুখেতে নীল স্বচ্ছ সরোবরে
ফুটিল কতই ফুল ॥

শ্যামল তৃণের কোমল আসনে
আবেশে বসিল সে।
ডাহিনে হেলিয়া, পড়িছে ঢলিয়া
পুলকে পূরিছে দে' ॥

আঁকিতে আঁকিতে শোভন সে-রূপ
নিঁদ আঁখিতে ছায়।
শ্রীমুখ তাঁহার, নারিনু তুলিতে
ঘুমা'য়ে পড়িনু হায় ॥

* * * *

জাগিয়া দেখিনু বেলা অবসান
একেলা চলিনু জলে।
আমাতে গো যেন, আমি আর নাই
( যেন ) চলেছি স্বপন বলে ॥

সে মধুর রূপে ভরল এ দিঠি
(শুনি) কি মধুর গীতি কাণে।
সে রূপে সে গীতে, মন্ত্রমুগ্ধ যেন
ডুবিনু তাহারি ধ্যানে॥

* * * *

জানি না কেমনে জাগিনু সহসা
চকিতে মেলিনু আঁখি।
যেই মুখ-খানি নারিনু আঁকিতে
তাই কি সমুখে দেখি!
(অমনি) মুদিল নয়ান, কাঁপিল হৃদয়
মোহে ঝাঁপিল চিত।
জীবনে মরণে করে কোলাকোলি
বুঝি না একি এ রীত॥

---

২

[ নায়ক পক্ষে ]

বরণে কিরণে খেলে লুকাচুরি,
বাসন্তী সাঁঝের বেলা।
অকারণে হিয়া, উঠিল কাঁদিয়া,
জুড়াতে করিনু মেলা॥

কোথা বা যাইব, কিসে জুড়াইব,
কিছুই নাহিক জানি।
দুটি চক্ষু মোর পড়িল যে দিকে
ধরিনু সে পথখানি॥

কভু আশে পাশে কভু বা আকাশে
চাহিয়া চলিনু বাটে।
সহসা চমকি, দেখিনু তাহারে
জলেরে যাইছে ঘাটে॥

* * * *

রাঙ্গা-বাস পরি' নামিছে সন্ধ্যা
পছিম গগন-কোলে।
পূজিবারে তারে, নাহিছে জগত
অলকা-আলোক-জলে॥

লতায় পাতায়, ধরণীর গায়
পড়িছে গলিয়া সোণা।
( সেই ) সোণার তরঙ্গে লাবণির তরী—
ভাসে মরাল-গমনা॥

* * * *

সোণার কলসী ধরিয়া কক্ষে
পৃষ্ঠে দুলা'য়ে বেণী।
বিজন পথেতে, আপন ভাবেতে
মগন চলেছে ধনি॥

কোথা তার প্রাণ, কোথাই বা দেহ,
কিছু যেন নাহি জানে।
হেন মনে লয়, মুরলী কাহারো
বুঝিবা বাজিছে কাণে॥

ডাগর ডাগর নীরদ নয়ন
চেয়ে যেন কারো পানে!

সে রূপ-সায়রে ডুবিবার ভয়ে
চলেছে সিনান-ভাগে ॥

*   *   *   *

ছায়াটা আমার পড়িল সহসা
তাহার চরণ আগে।
হরিণীর মত চমকিয়া উঠি
চাহিল আমার বাগে ॥

তড়িত-চমকে সে আঁখির জ্যোতিঃ
লাগিল আমার চোকে।
নিভিল তখনি, আঁধার ভুবন—
আগুন আমার বুকে ॥

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

# পার্ব্বতীর প্রণয়

আমরা আজ কালিদাসের একটি প্রণয়ের অদ্ভুত চিত্র দেখাইব। আমাদের কবিরা যে প্রণয়ের বর্ণনায় কত উচ্চে উঠিতে পারিতেন তাহা দেখান এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে লোকে যে বলে কালিদাস বড় অশ্লীল সেই কথাটার একটা মীমাংসা করিতে হইবে। সত্য সত্যই কি কালিদাস অশ্লীল? সত্য সত্যই কি তাঁহার কাব্য পড়িলে লোকের মনে কুভাবের উদয় হয়, ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়? সত্য সত্যই কি তিনি স্থানে অস্থানে কেবল বখামীই করিয়া গিয়াছেন। আমার ত বোধ হয় তিনি তাহা করেন নাই। তিনি অতি বড় কবি। জগতের এমন সুন্দর

পদার্থ কিছুই নাই যাহা তিনি বর্ণন করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের মিলন জগতের একটা সুন্দর হইতেও সুন্দরতর জিনিস, সুতরাং সে জিনিস-টাও তাঁহাকে বর্ণনা করিতে হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে, বিক্রমো-র্ব্বশীতে, শকুন্তলার এই মিলনই মূলমন্ত্র, তাহার সঙ্গে আরও অনেক ভাল কথা আছে। কুমার ও রঘুতে সারা জগৎটাই আছে, তাহার মধ্যে এ মিলনও আছে। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন কালিদাস ঐ কথা বই আর অন্য কথা কহেন না, তাঁহারা বড়ই বাড়াবাড়ি করেন বলিয়া মনে হয়। কালিদাস এক জায়গায় বাধ্য হইয়া কামকলার বর্ণনা করিয়াছেন। সে রঘুবংশের উনবিংশে—সর্গটীর নাম "অগ্নিবর্ণ—"। কিন্তু তাহার বর্ণনাও কত চাপা। একজন বড় রাজা, বয়স অল্প, রাজকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, মন্ত্রীরা তাঁহার দেখা পায় না, প্রজারা দেখিবার জন্য বড় হৈচৈ করিলে জানালা দিয়া পা বাড়াইয়া দেন। তিনি উন্মাদের মত হইয়া কেবল স্ত্রীলোক লইয়াই আছেন। অথচ সেখানকার লেখা পড়িলে কালিদাস কত সাবধানে এই ভোগবিলাস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়; অশ্লীলতায় তত নহে।

এইরূপ স্থলে অন্য কবিরা কি করিয়াছেন, যদি দেখা যায়, কালিদাসকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অষ্টাদশ সর্গে নলদময়ন্তীর মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। সর্গের গোড়াতে তিনি বলিলেন বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রাদিতে যাহা কল্পনা করিতে পারে নাই, আমি এমন সব জিনিস বর্ণনা করিব। বলিয়াই তিনি নলকে দম-য়ন্তীর মহলে লইয়া গেলেন। মহলের প্রথমেই সব অদ্ভুত ছবি। প্রথম খানিতে ব্রহ্মা কামাতুর হইয়া কন্যা সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান। তাহার পরই ইন্দ্র কিরূপে অহল্যাহরণ করিতেছেন তাহার নাটক, এইরূপ প্রায় কুড়িটি শ্লোক। তাহার পর নল, দময়ন্তীর ঘরে গেলেন। সেখানকার সাজপাট সবই ঐ রকম। তাহার পর বিছা-নায় উঠিলেন, সখীরা সরিয়া গেল। এইখানেই থামিয়া গেলে আমার

পক্ষে ভাল হইত। কিন্তু ঐ সর্গের ১৪০ হইতে ১৫২ শ্লোক এত ভয়ানক যে স্ত্রীপুরুষেও বসিয়া পড়া যায় না। যাঁহারা সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়ের ছোট ছোট নবেলগুলি পড়িয়া নাক সিটকান, আর নারায়ণের নিন্দা করেন, তাহারা যদি একটু শ্রমস্বীকার করিয়া নৈষধের ঐ সর্গটি পড়িয়া দেখেন, বড় ভাল হয়। তাহার উপর আবার বলি, ঐ সর্গটি সংস্কৃত উপাধিপরীক্ষায় পাঠ্য। টোলে টোলে উহা পড়াইবার কথা। সংস্কৃত পরীক্ষার বোর্ড উহা পাঠ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সভায় সভাপতি স্বয়ং আশুতোষ, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ উহার মেম্বর। টোলের এবং কলেজের অধ্যাপকগণও মেম্বর। শুনিলাম, নাকি যিনি অশ্লীলতার উকীল সরকার, পবলিক প্রসিকিউটার, যিনি লোকের অশ্লীলতা লইয়া অনেকবার নালিসবন্দ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রস্তাবে ঐ সর্গ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এসব বর্ণনার সঙ্গে তুলনা করিলে কালিদাস ত বাপের ঠাকুর। সত্য সত্যই ঋষি। তাহার বর্ণনা খুব চাপা—রঘুর উনবিংশ হইতেই একটি শ্লোক তুলিতেছি—

> চূর্ণবভ্রু লুলিতস্রগাকুলং
> ছিন্নমেখলমলক্তকাঙ্কিতম্
> উত্থিতস্য শয়নং বিলাসিন-
> স্তস্য বিভ্রমরতান্যপাবৃণোৎ ॥

তিনি আরও দুই চারি জায়গায় বাধ্য হইয়া একটু একটু অশ্লীলতা আনিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে অশ্লীল তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বুঝিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছাত্রদের জন্য যে সকল এডিশন্ করিয়াছেন তাহাতে উহা বাদ দেন নাই। যথা—

> পর্য্যাপ্ত পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ
> স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
> লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুঃ
> বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥

এসকল কবিতার তর্জ্জমা করিয়া দিলেও কেহ বুঝিতে পারিবেন না যে উহার রুচিবিরুদ্ধ কোন জিনিস আছে। না বুঝাইয়া দিলে কেহ সেকথা বুঝিতে পারিবেন না।

না হয় মানিয়া লইলাম, কালিদাস যে প্রণয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে রুচিবিরুদ্ধ কিছু না থাকিলেও, ইহলোকের কথাই প্রবল। কিন্তু আমরা আজি যে কথা বলিতেছি তাহা অপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের প্রণয়, বোধ হয়, ঋষিরাও কল্পনা করিতে পারিয়াছেন কি না? অন্য কবিদের ত কথাই নাই।

সে প্রণয় পার্ব্বতীর প্রণয়, শিবের প্রতি প্রণয়। যে প্রণয়ে দুয়ে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেই প্রণয়। এই প্রণয়ের মহত্ব বুঝিতে হইলে, ইহার পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ইহার অলৌকিক ভাব বুঝিতে হইলে, আগে পার্ব্বতী কে ও শিব কে তাহা জানা আবশ্যক; নহিলে এ আকর্ষণের উদারতা বুঝা যাইবে না।

পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ছিলেন। স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মহাদেবকে বিবাহ করিয়াছিলেন, দক্ষ তাহাতে বড় চটিয়া যান। তিনি এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন। যজ্ঞে সকল দেবতার নিমন্ত্রণ হয়। মহাদেবের হয় না। দক্ষের কন্যা সতী ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া স্বামীর অনুমতি লইয়া বাপের বাড়ী যান। সেখানে দক্ষ শিবের অনেক নিন্দা করেন, সেই নিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করেন। তিনি দেহত্যাগ করিলে মহাদেব শক্তিশূন্য হইলেন, তিনি সব সঙ্গ ত্যাগ করিয়া তপস্যায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। তাঁহার গণ নন্দী ভৃঙ্গী ইত্যাদি যা খুসী তাই করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কখন মনছাল গায়ে মাখে, কখন নমেরুর ফুল দিয়া সাজসজ্জা করে, কখন ভূর্জ্জপত্রের কাপড় পরে, কখন শুয়ে থাকে, কখন বসে থাকে, কখন লাফালাফি করে।

মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়! তিনি ধ্যানেই মগ্ন থাকেন, গঙ্গার ধারে একটা দেবদারুগাছের তলায় থাকেন, মৃগনাভির গন্ধ শুঁকেন, বাঘছাল

পরেন আর কিন্নরদের গান শুনেন। পার্ব্বতী ত মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন নাই। তিনি মরিয়াছিলেন ; আবার জন্মিয়াছেন। এবার তাঁহার পিতা হিমালয়, মাতা মেনকা, ভাই মৈনাক। তিনি একমাত্র কন্যা ; বড় আদরের ধন। তাঁহার আদরের আরও কারণ এই যে, ইন্দ্র পাছে ডানা কাটিয়া দেন, এই ভয়ে তাঁহার ভাই জলেই ডুবিয়া থাকেন, বাড়ী আসিতে পারেন না।

পার্ব্বতী এবার বড়—বড় ঘরে জন্মিয়াছেন। কালিদাস প্রথমেই তাহার বাপের বর্ণনা করিয়াছেন। এবং সে বর্ণনায় সতরটি কবিতা খরচ করিয়াছেন। তিনি হিমালয়ের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়, আমরা এবার সে বর্ণনার কথা বলিব না। তবে তিনি যে প্রকাণ্ড, তিনি যে পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছেন, সে কথাটা বলিতে হইবে, আর তিনি যে কত উঁচু সে কথাটাও বলিতে হইবে। তিনি মেরুর সখা অর্থাৎ মেরু যত উঁচু তিনিও তত উঁচু। সূর্য্য মেরুর যেমন চারিদিকে ঘোরেন, তাঁহারও তেমনি চারিদিকে ঘোরেন। তাঁহার শিখরে যে সব পুকুর আছে, সে পুকুরে ত পদ্ম হয়। কিন্তু সূর্য্য যদি নীচুর দিকে রহিলেন তবে সেখানে পদ্ম ফোটে কি করিয়া। তাই কালিদাস বলিয়াছেন সূর্য্য উপরের দিকে কিরণ পাঠাইয়া সে সব ফোটান, তাঁহার মাথা সূর্য্যমণ্ডলেরও উপর। এ ত তাঁহার স্থূল দেহ, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ একটি দেবতা। প্রজাপতি দেখিলেন, সোমের উৎপত্তি ত হিমালয় ছাড়া হয় না, তাই তিনি হিমালয়কে দেবতা করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে যজ্ঞের একটা ভাগ দিলেন, সকল পর্ব্বতের রাজা করিয়া দিলেন। কালিদাস, যজ্ঞের ভাগ দিলেন,—এইটুকু বলিয়াছেন, কি ভাগ দিলেন তাহা বলেন নাই। বেদে আছে যজ্ঞে যে হাতী মারা হয়, সেই হাতীটি হিমালয়ের ভাগ, সুতরাং প্রজাপতির সৃষ্টিতে যাহা কিছু বড় সকলই হিমালয়ের সঙ্গে জড়িত।

এই যে এত বড় হিমালয়, ইনি বিবাহ করিলেন কাহাকে ?

এত বড় বরের এত বড় কনে নহিলে ত সাজে না। এ মেয়ে কোথায় মিলে। মিলিল মেনকা। মেনকা কে? বেদে দ্যৌঃ আর পৃথিবী দুটিকে জুড়িয়া দ্যাবাপৃথিবী নামে এক জোড়া অথচ এক দেবতা আছেন। সেই দেবতাকে কখনও কখনও দ্বিবচনে "মেনে" বলিত। মেনা শব্দের দ্বিবচনে মেনে। মেনা হইতে মেনকা করা বিশেষ কঠিন নয়। এখন দেখুন পৃথিবী ও আকাশ জুড়িয়া যে দেবতা আছেন, মেনকা সেই দেবতা। হিমালয় যেমন বর, কনেটি ঠিক তাহার সাজন্ত হয় নাই? তাই কালিদাস মেনকার বিশেষণ দিয়াছেন "আত্মানুরূপাং" অর্থাৎ হিমালয়ও যেমন, মেনকাও তেমনি। বেশ জোড় মিলিয়াছে। এই যে হিমালয় ও মেনকায় বিবাহ, এ যে কেহ কবির চক্ষে দিগন্তের কোলে হিমালয়কে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছেন।

এই যে দ্যাবাপৃথিবীর সহিত হিমালয়ের বিবাহ, এ বিবাহে প্রথম সন্তান মৈনাক অর্থাৎ সমুদ্রের পর্ব্বত। সেও বাপের মত দিগন্ত বিস্তৃত। তবে সে হিমালয়ের মত অচল নহে। আজ এ-সমুদ্রে, কাল ও-সমুদ্রে তাহার প্রভাব দেখা যায়। তাই কবি বলিয়াছেন, সকল পর্ব্বতের ডানা কাটা গিয়াছে, মৈনাকের ডানা কাটা যায় নাই। সে লুকাইয়া সমুদ্রের মধ্যে আছে, এবং এখনও নড়িয়া বেড়াইতে পারে। পর্ব্বতের ডানা কাটা কথাটি নিতান্ত গাঁজাখুরী নহে। যে কেহ মুসুরীর বাজারে দাঁড়াইয়া একবার শিবালয় পর্ব্বতের দিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারই মনে হইয়াছে, যেন একসার ডানাকাটা পায়রা পড়িয়া আছে।

হিমালয় ও মেনকার দ্বিতীয় সন্তান পার্ব্বতী। যেমন মা, যেমন বাপ, যেমন ভাই,—মেয়েও তেমনি। তিনি জগত-জননী, তিনি আদ্যাশক্তি, সর্ব্বব্যাপিনী। তাঁহার অন্তর্ধানে মহাদেব শক্তি-শূন্য, কেবল ধ্যান করিতেছেন—আবার কবে আমার শক্তি আসিবে। কালিদাস বলিয়াছেন, "কেনাপি কামেন তপশ্চচার"। যিনি অন্যে

তপস্যা করিলে তাহার পুরস্কার প্রদান করেন, তিনি আবার কিসের জন্য তপস্যা করিবেন। তাঁহার কি কামনা থাকিতে পারে? কোন অনির্ব্বচনীয় কামনা আছেই। সে কামনা আবার শক্তিলাভ। কালিদাস "কিম্" শব্দের "অনির্ব্বচনীয়" অর্থ আরো স্থানে স্থানে করিয়াছেন।

আরও একটা কথা, দেবতাদের একজন নূতন সেনাপতির দরকার। ব্রহ্মা তারকাসুরকে বর দিয়াছিলেন, তুমি দেবগণের অবধ্য হইবে। সুতরাং সে এখন প্রবল হইয়া দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করিয়াছে এবং নানারূপে তাঁহাদের কষ্ট দিতেছে। ব্রহ্মা বলিয়া দিয়াছেন, তোমরা তাহাকে জয় করিতে পারিবে না। মহাদেবের ছেলে হইলে সেই তাহাকে জয় করিতে পারিবে। কিন্তু মহাদেব ধ্যানমগ্ন। তিনি পরজ্যোতিঃ, আমিও তাঁহার ঋদ্ধি ও তাঁহার প্রভাব ইয়ত্তা করিতে পারি না, বিষ্ণুও পারেন না। সুতরাং আমরা যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বিবাহ করাইব, সে ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে তিনি উমার রূপে আকৃষ্ট হইতে পারেন। যাহাতে হন, তোমরা তাহাই কর। তিনি আকৃষ্ট হইবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার ছেলে হইবে, সেই ছেলে তারকাসুরকে বধ করিবে।

এই পার্ব্বতী ও মহাদেবের প্রণয় আমাদের বর্ণনায় পদার্থ। নারদ একদিন হিমালয়ের বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিকটে পার্ব্বতী রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই মেয়েটি মহাদেবের একমাত্র পত্নী হইবেন এবং একদিন তাঁহার অর্দ্ধেক শরীর লাভ করিবেন। এই কথা শুনিয়া হিমালয় আর অন্য বরের চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি ত আর যাচিয়া কন্যা দিতে পারেন না, তাহাতে আবার মহাদেব কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন, এ সময়ে বিবাহের কথাই হইতে পারে না। তাই তিনি একদিন মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিলেন আমার এই মেয়েটি আপনার আরাধনা করিবেন, আপনি অনুমতি

করুন। মহাদেব বলিলেন "আচ্ছা"; কেন, মহাদেব বেশ জানেন যে তাঁহার কিছুতেই চিত্তবিকার হইবে না।

পার্ব্বতী সেই অবধি অনন্যমনে মহাদেবের সেবাশুশ্রূষা করেন, তাঁহার পূজার ফুল তুলিয়া দেন, তাঁহার পূজার যায়গা করিয়া দেন, তাঁহার জল তুলিয়া দেন, তাঁহার কুশ আনিয়া দেন। এই-রূপে নিত্যই তাঁহার সেবা করেন। মহাদেব তাঁহাকে কিরূপভাবে দেখেন সে কথা কবি বলেন নাই; তবে তিনি বলিয়াছেন যে পার্ব্বতী মহাদেবের মাথায় যে চন্দ্রকলা আছে তাহারই কিরণে আপনার ক্লান্তি দূর করেন। তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে ঐ টুকুই এত সেবার পুরস্কার। মহাদেব তাঁহাকে তাঁহার কপালের চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিতে দেন, তাহাতেই পার্ব্বতী কৃতার্থ।

এইভাবে দিন কাটিতেছে। কিন্তু দেবতাদের দেরী সয় না। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইন্দ্র সভা করিয়া মদনকে ডাকিলেন। তাঁহাকে দেবতাদের অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন। বলিলেন, "তুমি একটা বাণ মারিয়া আমাদের রক্ষা কর"। মদন ভাবিলেন কাজটি খুব সোজা—তিনি বসন্তকে ডাকিলেন, রতিকে সঙ্গে লইলেন ও মহাদেবের আশ্রমে গিয়া পঁহুছিলেন। বসন্ত অকালে হিমালয়ে আবির্ভূত হইল। স্থাবর জঙ্গম সব আনন্দিত ও মিলনের আশায় উৎফুল্ল। আশ্রমের বাহিরে ফুল ফুটিল, পশু-পক্ষী জোড় বাঁধিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্নর কিন্নরী গলা মিলাইয়া গান করিতে লাগিল। মহাদেবের গ্রাহ্যও নাই। তিনি যথাসময়ে ধ্যানস্থ হইলেন। নন্দী দেখিলেন, গণেরা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি একটি আঙ্গুল মুখে তুলিয়া তাহাদের বলিয়া দিলেন "ঠাণ্ডা হও"। অমনি গণেরা চুপ। বসন্তের সব জারি-জুরি ভাঙ্গিয়া গেল। মদনও পিছন হইতে বাণ উঁচাইতেছিলেন। কিন্তু মহাদেবের চেহারা দেখিয়াই তাহার হাত থেকে ধনুক ও বাণ পড়িয়া গেল; তাহা তিনি টেরও পাইলেন না। তাঁহারও জারিজুরি

সব ভাঙ্গিয়া গেল। এমন সময়ে পার্ব্বতী আসিলেন। মদন লুকাইয়া নন্দীকে এড়াইয়া আশ্রমের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন। বসন্ত তাহাও পারেন নাই। তিনি এখন পার্ব্বতীকে আশ্রয় করিয়া, তাহাকে ফুলের গহনা পরাইয়া, সেই সঙ্গে কোনওরূপে আশ্রমে আসিলেন। পার্ব্বতীও আসিলেন, মহাদেবেরও ধ্যানভঙ্গ হইল। মদনেরও আশা হইল, ভরসা হইল। পার্ব্বতী রীতিমত পূজা করিলেন। তাহার পর একগাছি পদ্মের বিচির মালা লইয়া মহাদেবকে দিতে গেলেন, মহাদেবও হাত বাড়াইয়া লইলেন এবং "অনন্যসাধারণ পতি লাভ কর" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মদন ভাবিল, মাহেন্দ্রক্ষণ; সে বাণ জুড়িল। মহাদেবের মনের ভিতরে যে মন আছে তাহাতে একটু কেমন কেমন করিয়া উঠিল। তিনি চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন মদন, তাঁহার ক্রোধ হইল, তাঁহার কপালের চক্ষু হইতে আগুন বাহির হইল, আর অমনি মদন ভস্মসাৎ। মহাদেবের রূপজ মোহ নাই, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ নাই, তাই তিনি মোহের যিনি কর্ত্তা তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিলেন ও সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি সর্ব্বময়, কোথায় গেলেন কেহই জানিল না।

মদন যখন বাণ উঁচাইয়াছিলেন, তখন পার্ব্বতী মহাদেবের সম্মুখে, সে বাণে তাঁহারও রোমাঞ্চ হইল। তাঁহার লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি মুখ হেট করিয়া নীচের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু সামলাইয়া উঠিলে তাঁহার বড় দুঃখ হইল, যে বাবার এত বড় আশা ব্যর্থ হইল। তিনি নিজ রূপের উপর ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং শূন্যমনে বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহার পিতা আসিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন। সব ফুরাইয়া গেল। হিমালয়ের আশালতা নির্ম্মূল, দেবতাদের আশা নির্ম্মূল। মদন পুড়িয়া ছাই; রতি মূর্চ্ছিত। পার্ব্বতী কিন্তু আশা ছাড়িলেন না।

মহাদেব চোখের উপর মদনকে যখন ভস্ম করিয়া ফেলিলেন,

তখন আর কি আমার দিকে চাহিবেন, এই ভাবিয়া পার্ব্বতী বড় ম্রিয়মাণ হইয়া গেলেন। বৃথা আমার রূপ হইয়াছিল, বলিয়া মনে মনে আপনার উপর তাঁহার বড়ই অবজ্ঞা হইল। আর সকল পথই ত বন্ধ; সুতরাং এখন তপস্যা ছাড়া উপায় নাই। সুতরাং তিনি তপস্যা করিতে সংকল্প করিলেন। মা ত শুনিয়া বারবার বারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিবারণ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন। জল নিম্নমুখ হইলে তাহার গতি যেমন রোধ করা যায় না, তেমনি যে মনে মনে স্থিরসংকল্প করিয়াছে, তাহারও গতি কেহ রোধ করিতে পারে না।

ক্রমে কথা বাপের কানে পঁহুছিল। তিনি বড় খুসী হইলেন। এত কঠোর না করিলে কি অমন স্বামী পাওয়া যায়। তপস্যার অনুমতি দিলেন। পার্ব্বতীও তপোবন যাত্রা করিলেন। সেখানে, মাথাপোরা চুল ছিল তাহাতে জটা পড়িয়া গেল, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা হইল, ভূমিতে শয্যা হইল। চক্ষের আর সে চঞ্চলভাব রহিল না। নিজেই জল তুলিয়া গাছে দিতে লাগিলেন। হরিণগুলিকে নিজ হাতে খাবার দিয়া বশ করিয়া লইলেন। তিনি যখন স্নান করিয়া, অগ্নিতে আহুতি দিয়া, বাঘছালের উড়ানি পরিয়া, বেদ পড়িতে বসিতেন, ঋষিরাও তাহাকে দেখিতে আসিতেন। ক্রমে তপোবন পবিত্র হইয়া উঠিল, জন্তুরা পরস্পর হিংসা ত্যাগ করিল, অতিথিসেবার জন্য ফলমূল তপোবনেই ফলিতে লাগিল, নূতন খড়ের ঘরে যজ্ঞের অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

ইহাতেও যখন মহাদেবের দয়া হইল না, তখন পার্ব্বতী আরও কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গ্রীষ্মকাল, মাথার উপর সূর্য্য, চারিদিকে চারিটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া পার্ব্বতী পঞ্চতপা করিলেন। তাহার চোখের কোলে কালি পড়িয়া গেল। উপবাসের পর তাঁহার পারণা হইত, আকাশের জল আর চন্দ্রের কিরণ। যখন বর্ষা আসিল, নূতন জল পড়িল, তাঁহার শরীর হইতে গরম বাহির হইতে লাগিল। তিনি ঘরে

থাকা বন্ধ করিলেন, আকাশের তলায় পাথরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। পৌষ মাসে জলে ডুবিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিতেন। তাঁহার মুখখানি পদ্মের মত জলের উপর ভাসিত। ঝরাপাতা খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতে পারিলেই লোকে মনে করে তপস্যার চরম হইল। কিন্তু পার্ব্বতী তাহাও ছাড়িয়া দিলেন। পাতার এক সংস্কৃত নাম পর্ণ। পাতা খাওয়াও ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল অপর্ণা। তপস্বীরাও এত কঠোর করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থায় একদিন তাঁহার আশ্রমে একজন জটাধারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইবার পার্ব্বতীর অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইল। জটিলের চেহারাটি খুব ভাল। তিনি আশ্রমে আসিয়া অতিথি হইয়াছেন; পার্ব্বতী ত যতদূর সম্ভব তাহার সংকার করিলেন। জটিলও জমকাইয়া বসিয়া আরম্ভ করিলেন—আপনি কেমন আছেন? আশ্রমের মঙ্গল ত? গাছপালা বেশ জল পায় ত? ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার এমন রূপ, তুমি এমন রাজার মেয়ে, তুমি তপস্যা কর কেন বল দেখি? কি কোন বরের কামনায়? আমি ত এমন কোন যুবক দেখি না যে তুমি কামনা করিলে, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মনে না করিবে। দেবতা চাও, তাহারা ত তোমার বাবার রাজ্যেই বাস করে। তোমায় হয় ত কেহ কোনও প্রকার অবমাননা করিয়াছে, তাই তুমি তপস্যা করিতেছ। তাহাও ত বোধ হয় না; তুমি হিমালয়ের মেয়ে, তোমায় অপমান করিতে পারে এমন কে আছে? যাহাই হউক, তুমি বড়ই কষ্ট পাইতেছ। আমার একটা কথা আছে, শোন, আমার অনেক সঞ্চিত তপস্যা আছে, তাহার অর্দ্ধেক তোমায় দিতেছি, তুমি আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া লও।

জটিল যখন পার্ব্বতীর হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিয়া এইমত কথা সব বলিল, তখন পার্ব্বতী সখীর প্রতি ইঙ্গিত করিলেন, সে সকল কথা বলিল। পার্ব্বতী যে মহাদেবের প্রতি আসক্ত, তাহা সে প্রথম

কথায়ই বলিয়া ফেলিল। বলিল মহাদেবের হুঙ্কারে মদনের যে বাণ ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল সে বোধ হয়, ইঁহারই হৃদয়ে বিঁধিয়া আছে। সেই অবধি ইনি বড় উন্মনা হইয়াছেন। কিছুতেই ইঁহার শরীর শীতল হয় না। কিন্নরীরা যখন মহাদেবের চরিত গাহিতে থাকে, তখন ইনি ভাবাবেশে গাইতে পারেন না, ইঁহার গলা ধরিয়া যায়, স্বরস্খলিত হয়, কিন্নরীরা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলে। শেষ রাত্রিতে অনেক বার স্বপ্নে মহাদেবকে পাইয়া "হে নীলকণ্ঠ তুমি কোথায়?" বলিয়া জাগিয়া উঠেন। তখন দেখা যায়, উঁহার হাত দুটি যেন কাহারও গলা জড়াইয়া আছে। অতি গোপনে নিজের হাতে মহাদেবের ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করেন "তোমায় পণ্ডিতেরা "সর্ব্বগত" বলেন; আমি যে তোমার তরে কাতরা, এটা কি তুমি জানিতে পার না? ইনি এতকাল তপস্যা করিতেছেন, যে উহার হস্তার্জ্জিত গাছেও ফল ধরিল। ইঁহার কিন্তু মনের অভিলাষ পূর্ণ হইল না, হইবার কোনও লক্ষণও দেখা যায় না। কবে যে দেবাদিদেব সখীর প্রতি দয়া করিবেন জানি না। সখীরা আর উঁহার মুখের দিকে চাহিতেও পারে না।

জটিল এই সব কথা শুনিয়া পার্ব্বতীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, এ সব কথা কি সত্য? না পরিহাস?

পার্ব্বতী এতক্ষণ স্ফটিকের অক্ষমালা জপিতেছিলেন। এখন মালা ছড়াটী হাতের আগায় রাখিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কথা কিন্তু ফুটিতে চাহে না। অনেক যত্নের পর কয়েকটি মাত্র কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইল। পার্ব্বতী যে, মহাদেবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী একথা আমরা এতক্ষণ, পরে পরেই শুনিতেছিলাম, আর তাঁহার আচার ব্যবহার দেখিয়া অনুমান করিতেছিলাম। এইবার তাঁহার নিজমুখে তাঁহার মনের কথা শুনিতে পাইব। সেও অতি অল্প কথা। কথাটা কি? জানিবার জন্য আমরা বড়ই উৎসুক। পার্ব্বতী বলিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন

সবই ঠিক। আমার আশা বড়ই উচ্চ; তাহারই জন্য এ তপ। কারণ—"মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে।"

পার্ব্বতীর মুখে এই যে অনুরাগের কথা শুনিলাম, এরূপ আর কোথাও কেহ শুনিয়াছ কি? ইহাতে চাঞ্চল্য নাই, ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভ নাই। ইহকালের কথাও নাই। ইহা স্থির, ধীর, অটল ও অচল প্রণয়। আমি কিছুই নই, আমার আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষামাত্র। কিন্তু আমার আর উপায় নাই, তাই আমি কঠোর তপস্যা করিতেছি। এই কথায়, কত দৈন্য, কত আত্ম বিসর্জ্জন, মহাদেবের প্রতি কত ভক্তি, কত শ্রদ্ধা ও কত প্রেম প্রকাশ পাইতেছে।

জটিল বলিল মহেশ্বরকে ত আমরা জানি। আবার তুমি তাঁহা-কেই প্রার্থনা করিতেছ। তিনি অমঙ্গলময় ইহা আমি জানি। আমি তোমার কথায় সায় দিতে পারি না। বড় অসদৃশ সম্বন্ধ—তোমার হাতে থাকিবে বিবাহের সূতা আর তাঁর হাতে থাকিবে সাপের বালা। এ দুটা কি খাপ খায়? তুমি খাসা চেলী পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে, আর তাঁর গায়ে হাতীর কাঁচা চামড়া হইতে টাট্‌কা রক্ত পড়িবে। তিনি দেখাইয়া দিলেন, মহাদেবের সঙ্গে পার্ব্বতীর বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। বলিয়া তিনি মহাদেবের কতই নিন্দা করিতে লাগিলেন। যিনি বাপের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অপরিচিতের মুখে এত শিবনিন্দা শুনিয়া সহ্য করিবেন, কখনই সম্ভব নয়। যিনি "আমি শিবের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী" এই কথা কয়টিও কহিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন "আপনি যাহা শুনিয়াছেন সব সত্য", এখন তাঁহার ভাব অন্যরূপ হইয়া গেল, তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল, চক্ষুর কোণ রাঙা হইয়া উঠিল, কোপে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, মুখে খৈ ফুটিতে লাগিল। তিনি স্থির স্বরে বলিতে লাগিলেন,—তুমি হরকে ঠিক জান না, জানিলে তুমি এমন কথা কেন বলিবে? নির্ব্বোধ লোকে মহাত্মার চরিত্র বুঝিতে পারে না, কারণ তাঁহার চরিত্র সাধারণ লোকের

মত নয়; তাহারা চিন্তা করিয়াও তাঁহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। এই বলিয়া ক্রমে জটিল মহাদেবের বিরুদ্ধে যত কথা বলিয়াছিল, সমস্ত গুলিই খণ্ডন করিয়া দিলেন। তিনি শেষে বলিলেন, তোমার সহিত বিবাদে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি তাঁহাকে যত মন্দ বলিয়া জান, তিনি তাই হোন। কিন্তু আমার মন তাহাতেই পড়িয়াছে, সে আর ফিরিবে না। আমি ইচ্ছায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, আমি নিন্দার ভয় করি না।

তাঁহার বাক্য শেষ হইলে তিনি দেখিলেন জটিলের ঠোঁট নড়িতেছে সে আবার কিছু বলিতে চায়। তিনি সখীকে বলিলেন—তুমি উঁহাকে বারণ কর, কারণ যে বড় লোকের নিন্দা করে সেই যে কেবল অপরাধী হয় এমন নহে। উহার কথা যে শোনে সেও তাই হয়। অথবা কথায় কাজ নাই, আমি এখান হইতে সরিয়া যাই।

বলিয়া তিনি যেমন সরিয়া যাইবেন, অমনি মহাদেব নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহার হাত ধরিলেন। পার্ব্বতীর একটি পা উঠিয়াছিল। সেটি সেই ভাবেই রহিল। তিনি ন যযৌ ন তস্থৌ হইয়া রহিলেন, তাঁহার শরীর ঘামে ভিজিয়া গেল ও কাঁপিতে লাগিল। মহাদেব বলিলেন, তুমি তপস্যা করিয়া আমায় কিনিয়াছ, আমি তোমার দাস। পার্ব্বতী যে এত কঠোর করিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার দেহে যেন নূতন স্ফুর্ত্তি আসিয়া পৌঁছিল।

এই যে প্রণয়, ইহাতে কামগন্ধের লেশও নাই। তাই সুরুতেই কামদেব ভস্ম হইয়া গেলেন। কাম বলিতে "স্পর্শ বিশেষ" বুঝায়; কিন্তু এখানে কাম শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় মাত্রেই। আমি আমার বাঞ্ছিতকে দেখিতেও চাই না, স্পর্শ করিতে চাই না, তাঁহার স্বর শুনিতেও চাই না, তাঁহার গাত্রগন্ধ আঘ্রাণও করিতে চাই না। চাই শুধু আপনার সব—মনপ্রাণ সব—সমর্পণ করিয়া তাঁহার পূজা করিতে; তিনি আমায় পায়ে রাখেন, এইটি জানিলেই আমি কৃতার্থ;

এই যে অপূর্ব্ব প্রণয়, এ একটা বড় তপস্যা। এই নিঃস্বার্থ প্রণয় লাভ করাও অনেক তপস্যার ফল। তাই পার্ব্বতী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোরথ সিদ্ধও হইয়াছিল। মহাদেব স্বয়ং তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। পরীক্ষায় জানিয়াছিলেন, পার্ব্বতী কাঁচা সোণা। তাই আপনাকে তাঁহার ক্রীতদাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। নিজে উপযাচক হইয়া, ঘটক খুঁজিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর মদনকে বাঁচাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর দু'জনে মিলিয়া এক হইয়া, গিয়াছিলেন। পার্ব্বতী শিবের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী হইয়াছিলেন। আর কাহারও ভাগ্যে তাহা হয় নাই। কোন দেবতারও নয়।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

---

## অন্তর্যামী

মন্দিরে মম হয় না আরতি
বাজে না ঘণ্টা কাঁসি,
বরণের ডালা পঞ্চপ্রদীপ
নাহি সাজ, নাহি হাসি।
সকাল সন্ধ্যা জনতা ভিড়ায়ে
বলিনি মন্ত্র বিনায়ে বিনায়ে,
পাড়া-প্রতিবেশী জটলা পাকায়ে
ফিরেনাকো করি ছল,
দেবতা আমার, নয়নের জলে
পূজি গো চরণতল!

ডাকিনি তোমারে সবে হেলাভরে
দেখায় রক্ত আঁখি,
ঢাকি নাই কিছু রাখি নাই বাকি
সাধ্য কি দিব ফাঁকি!
সকলের কাছে যতটুকু পাই,
তার বেশী দাবী কভু করি নাই,
যত ভালবাসা যত মোর আশা
তোমাতে লভেছে প্রাণ,
গোপনে তোমারে দিছি তা' ফিরায়ে
তুমি যা' করেছ দান!

হৃদয়-রতন, মনের মতন
কথা হয় শুধু কথা,

স্নেহ পরশনি ভুলায় বুলায়ে
যেথানে জাগিছে ব্যথা!
দুঃখেরে তাই করিয়াছি জয়,
শোক বেদনায় করি নাকো ভয়,
তুমি এস নামি, অন্তরযামী
সবার আড়ালে একা,
তোমার মিলন কাহিনী আমার
নয়নের জলে লেখা!

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ।

---

# ছোট গল্প

ওরে বদরি, সত্যেনবাবুকে চা দিতে বল; আর ভূষণবাবুর তাওটা বদলে দে। আর দেখ, যে বাবু এই চিঠীটা এনেছেন তাঁকে পাঁচ টাকা, আর এইটে যিনি এনেছেন তাঁকে দশ টাকা দিয়ে দে; বুঝলি? তারপর সত্যেনবাবু, খবর কি?

খবর ছোট গল্প চাই।

কত ছোট?

এই আন্দাজ তিন চার পৃষ্ঠা।

কেন, এবার ছোট গল্প আসেনি? প্রভাত মুখুযো, খগেন মিত্র, সরোজ ঘোষ, দীনেন্দ্র রায় প্রভৃতির মধ্যে কেউ পাঠান নি?

না। তবে এয়েছে একটা বটে; সেই আমাদের নূতন লোকটি পাঠিয়েছেন; কিন্তু সে চল্‌বে না।

কেন, চল্‌বে না কেন?

তার মধ্যে যে 'সুবিধা গ্রহণ'; 'গরম নিঃশ্বাস'; 'ঠাণ্ডা তারা'; 'ঠাণ্ডা জ্যোতি দিচ্চে' প্রভৃতি সব বাঙ্গলা কথা রয়েছে। সে ত আর আপনার কাছে চল্‌বে না। তা ছাড়া গল্পটার শেষ হয়নি। মানে, ক্রমশঃ?

না। তা হ'লে ত ছোট গল্প হ'ল না। গল্পটা এত হঠাৎ থেমে গেছে বা সমাপ্ত হয়েছে যে তাকে শেষ হয়েছে বলা যায় না এবং সে শেষে আর্টও মোটেই নেই।

আচ্ছা আপনি ঐ সেই গল্পটা পড়েছিলেন? ঐ যে কি একটা কাগজে বেরিয়েছিল—কে একজন শর্ম্মা লিখেছিল?

নায়িকা বিধবা; জোর করে তার বিয়ে দেয়, তারপর ফুল-শয্যার রাত্রে সে আত্মহত্যা করে এবং তার স্বামীকেও বিষদান করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তার ভাজকে একখানা চিঠীতে লিখে যায় কেন সে এমন কল্লে? সে চিঠীখানা মনে আছে?

ও বুঝেছি। আপনি "বিধবার প্রতিদান" বলে জাহ্নবীতে যে গল্প বেরিয়েছিল তার কথা বল্‌চেন? সে ত চমৎকার গল্প। তাতে ত আর্টের একেবারে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে। তিন পাত ত মোটে গল্পটা, তার আবার অর্দ্ধেক কোটেসানে পূর্ণ, তাতে আবার পাঁচ সাতটা character, সব গুলো সমান ফুটেছে। আর চিঠী-খানা ত masterpiece। তবে নীতির বা সমাজের হিসাবে ধর্‌তে গেলে গল্পটা বোধ হয় না-বেরণই উচিত ছিল। নায়িকা প্রভা কুন্দ-নন্দিনীকেও পরাস্থ করেছে।

বিলক্ষণ! তা হলে ত প্রায় সব বড় বড় ফরাসী ও ইংরেজ লেখকের অধিকাংশ গল্পই বেরণ উচিত ছিল না। যাই বলুন প্রকৃ-তির প্রতিশোধ কেউ রদ করতে পারবে না। আর realism এর একটু আদটু touch না থাকলে লেখাও ত যায় না। খাঁটী idealistic লেখা, সে ত দর্শন—life নয়। যাক আপনি এক কাজ করুন না কেন? সেই ফরাসী গল্পটা বাঙ্গলা করে দিয়ে দিন না কেন?

কোন্‌টা বলুন দেখি ?

সেই যে একদিন সন্ধ্যার সময় সেণ্ট মাইকেলের গিরজার একটা sexton ঘণ্টা বাজাচ্ছিল ; তার পর একজন সবে মাত্র বিধবা হয়েছে এসে বল্লে, তুমি যদি আমায় সন্তান প্রদান কর্‌তে পার ত তোমায় একশ না কত ফ্রাঙ্ক দেব। তার পর টাকা দিলে না ; তাই নিয়ে মামলা আদালত অবধি গড়াল ; তখনও স্ত্রীলোকটী sextonএর ঔরসজাত শিশু প্রসব করেনি ; উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীতে কোনও কথাই পরিষ্কার হ'ল না দেখে জজ মহা মুস্কিলে পড়্‌লেন—এ মোকদ্দমার বিচার কিরূপে হয়। শেষ মাঝামাঝি রকমের কি একটা নিষ্পত্তি হয়ে গেল ? আপনার মনে পড়চে না ?

খুব পড়চে। কিন্তু সে গল্প কি এদেশে রুচি-সঙ্গত হবে ?

কেন হবে না ? তবে, অবশ্য, সে রকম করে লিখ্‌তে পারা চাই। তেমন delicate handling না হলে জিনিসটা মাটি হয়ে যাবে। তা ছাড়া আরও দেখুন ; মানুষের হৃদয় বলে যে জিনিসটা আছে তার সম্বন্ধে, কি মানব-জীবনের সম্পর্কে কি দেশ কাল পাত্র ভেদে বিচার করা চলে ? আমাদের অর্থাৎ যে কোনও একটি জাতি বিশেষের শাস্ত্র, রীতি ও সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ত আর দুনিয়া পড়ে থাক্‌তে চায় না ; পারেও না। যাক্‌। যে লেখাটা এসেছে তার প্লট-টা কি ও কি রকমের বলুন দেখি ?

প্লটের রকম ত কিছুই নেই। মানে, প্লটই নেই, তার আর রকম কি থাক্‌বে ?

না, না, আমি বলচি গল্পটা কি ? ট্রাজিডি, না মিলনাত্মক না কি ?

ট্রাজিডিও নয়, মিলনাত্মকও নয়, এমন কি ফার্স ও নয়। কেন না লেখার মধ্যে রসিকতার যে একটু আদটু উদ্যম আছে তাতে হাসি আসে না। বরং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলা যেতে পারে।

আপনি দেখছি বড় বিপদে ফেল্‌লেন। গল্পের নায়ক-নায়িকা

করতে চায় কি? নায়িকা অবশ্য, কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে পুড়ে মরেনি সেটা বোঝা যাচ্ছে! কেন না আপনি বল্লেন গল্পের শেষ কিছু হয়নি। সুতরাং আফিমও খায়নি, জলেও ডোবেনি, উদ্বন্ধনেও ঝোলেনি। এখন যা হ'ক ভাষা সুধরে কাটাকুটি করে একটা দাঁড় করাতে হবে ত? নায়ক ছোকরা করে কি? পাস্-টাস্ করেছে? বয়েস কত? কবিতা কি গল্প-টল্প লেখে?

বয়েস আন্দাজ তেইশ চব্বিশ হবে। মাঝে একবার আই, এ, ফেল করেছিল। উপস্থিত এম, এ, দিয়ে পিতৃবন্ধুর ওখানে, পুরীতে, বেড়াতে গেছে। সঙ্গে সমবয়সী খুড়তুতো ভাই আছে; তার বিবাহ হয়েছে। যাবার সময় তার স্ত্রী মাথার দিব্য দিয়ে বলে দিয়েছে, "দেখ ঠাকুর-পো ওঁকে যেন সেখানে বেশী দিন ধরে রেখ না।" উত্তরে নায়ক বলেছেন—"ভয় নেইগো আমি পহুঁছেই তোমার ওনাকে রেজেষ্ট্রী খামে ফিরতি ডাকে পাঠিয়ে দেব।"

বেশ। তার পর?

তার পর সেই পিতৃবন্ধুর এক সমর্থ মেয়ে সেখানে আছে।

বুঝিছি; দেখতে কি রকম সেই মেয়ে?

সেইটে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রূপ-বর্ণনার মধ্যে কেবল সুন্দর কোঁকড়া চুলের উল্লেখ আছে। বাকি টুকু উপমায় সেরেছেন। ঝরা ফুল; হাতের মধ্যে রাখ্‌লে যেমন অঙ্গুলের চাপে ম্লান হয়ে পড়ে, ভাবটা অনেকটা সেই রকম। ফুলটি গোলাপ কি পলাশ; চাঁপা কি টগর; যূঁই কি শেফালি; বেলা কি মল্লিকা; সেটা ঠিক ধরা গেল না। তবে শেষের চারিটির মধ্যে যা হয় একটি হবে; কেন না, মেয়েটি বিধবা এবং শাদা থানই তার দেহ-লতার আবরণ।

বটে? তার পর?

তার পর আর এমন কিছু নয়। মাসখানেক না যেতে যেতে তার অমন সুন্দর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি ছোট ছোট করে কেটে ফেল্লে; নিজের হাতে রেঁধে একবেলা করে খেতে লাগ্‌ল। আর

নায়কও নাকি মেয়েটিকে সমুদ্রের বিজন বিস্তীর্ণ বেলা ভূমির উপর বসে দু'একদিন কাঁদ্‌তে দেখেছিল এবং রকম সকমে বুঝ্‌তে পেরেছিল নায়ককে লুকিয়েই কান্নাটা কাঁদা হয়।

তবে আবার এমন কিছু নয় বল্‌চেন কেন? এই ত বেশ হচ্চে, তার পর?

হলে ত বেশই হ'তে পার্‌ত, কিন্তু তাত আর হল না। মানে তার পরই হয়ে গেল; উপসংহারটা কি হ'ল বা হ'তে পার্‌ত, তা ত আর জানা গেলনা কি না। এই কান্নাকাটির ব্যাপার দেখে নায়ক তার ভাইকে নিয়ে রাতারাতি সরে এল; মেয়েটি তখনও ফোঁপাচ্চে। এই হ'ল গল্পের শেষ।

পাগল আর কি! তা ত হ'তে পারে না কিনা। যাহ'ক আপনি কি কর্‌তে চান? নায়ককে মারতে চান না নায়িকাকে সরাতে চান? গল্পের ধাঁজটা যে রকম তাতে মিলন হ'তে পারে না। নায়কটা লিটারেচারে এম, এ, দিয়েও কি রকম অসম্ভব ভীরু কাপুরুষ সেটা বুঝচেন ত?—He is deserting the situation of his own creation সে সম্বন্ধে আর ভুল নেই। এক ওটাকে পাগল করে দেওয়া যেতে পারে, কিম্বা সন্ন্যাসী। আর একটা character থাকলে আপনি না হয় নায়িকার যা হ'ক একটা সুবিধে করে দিতেন তাতে আমার আপত্তি ছিল না। না কি? ঐ খুড়তুতো ভাইকে জড়াবেন? ও বেচারীর কিন্তু স্ত্রী রয়েছে যে; complications বেশী বাড়াতে গেলে এদিকে আবার ছোট গল্পের সীমা অতিক্রম করে? যা হ'ক কি বলেন? শেষ ত করা চাই।

তা হ'লে নায়ক নায়িকার মিলন ঘটিয়েই শেষ কর্‌তে হয়। নইলে আবার poetic justice অর্থাৎ কাব্য-সঙ্গতি বজায় থাকে না যে।

ওঃ poetic justice! আপনি যে দেখছি Nahum Tait হয়ে পড়লেন। কি বলেন ভূষণ বাবু, অ্যাঁ?

আমি আর কি বল্‌ব বলুন ?

তবে আর কি ? শুনলেন ত সত্যেন্দ্র বাবু ?

তা ত শুনলাম। উপস্থিত ওসব শুনে ত ফল নেই। এখন গল্পের কি করা যায় ?

করবেন আবার কি ? এই নিন না। দেখুন দেখি, এতে তিনচার পাত হবে না ? আমার বোধ হয় বরং বেশী হবে। তা এর কমে ত আর ছোট গল্প হয় না। তাতে আবার দু'তিনটে ছোট গল্প এক সঙ্গে। আপনি বুঝি ভাবছিলেন আমি আর কি লিখচি ?

তা হ'লেও ত সেই রইল—যথা পূর্ব্বং তথা পরং। গল্পের শেষ ত আর হ'ল না।

তা বেশ এক কাজ করুন; একখানা চিঠীর অবতারণা করে পাঁচ সাত দশ লাইনের মধ্যে যা হ'ক একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলুন। সেইটেই সবচেয়ে সহজ এবং শীঘ্র হবে। ঐ প্রিন্টারও আসছে তাগাদা কর্‌তে। কি রমেশ, এই যে হচ্চে, হচ্চে; আর, দু'দশ মিনিটের মধ্যেই তোমায় কাপি দিচ্চি। নিন সত্যেন্দ্র বাবু সেরে ফেলুন। চিঠীটা নায়িকাই লিখুক ঐ খুড়তুতো ভায়ের স্ত্রীকে। নিন লিখুন দেখি ?

তা লিখছি, কিন্তু আপনিও যেন নিতান্ত সংক্ষেপ করবেন না। খাপছাড়া যেন না হয়; বলুন।

ভাই বৌ-দিদি,

আপনার দেবরের বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাইয়াছি, আমার উপর আপনার বড় দয়া। এই ছয় মাসের পত্র ব্যবহারে তাহা বুঝিয়াছি। বিবাহের যৌতুক স্বরূপ বরের জন্য সোনায় বাঁধান এক ছড়া চুলের চেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্য সিন্দূরপূর্ণ একটি সুবর্ণ কৌটা পাঠান হইল। আমার সিন্দুর দানের অধিকার নাই, সুতরাং এ উপহার মার। চেনের সঙ্গে লকেট দিতে হয় আপনি আমার হইয়া একটি উপযুক্ত

লকেট চেনে পরাইয়া দিবেন। একটি সাধ আমার আছে; ইচ্ছা করিলে পূর্ণ করিতে পারেন। দয়া করিয়া তাহা করিবেন কি? আপনার দেবরের সন্তান হইলে তাহার অন্নপ্রাশনে তাহাকে কোলে লইবার ও নামকরণ করিবার ইচ্ছা আছে। যদি সে অধিকার দেন তবে সংবাদ পাইলে তখন যাইব। আশা করি ততদিন জীবিত থাকিব। এখন আমার যাওয়া হইল না। বাবা একলাই যাইতেছেন। শুভপরিণয় নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হ'ক। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

আপনার ভগ্নী অপর্ণা।

পুঃ—এখানে যখন আসেন, আপনার দেবরের একখানি খাতার মধ্যে চোতা কাগজে লেখা এই কবিতাটি ছিল:—

সাধের প্রতিমা, সখি, দূরে দূরে সাজে ভাল;
চেয়োনা পারশে তারে—পরশে সে হবে কাল।
স্মৃতির মন্দির মাঝে,
যে রাজে মধুর সাজে
কেন তারে পেতে কাছে সতত ব্যাকুল, বল?
সাধের প্রতিমা, সখি, দূরে দূরে সাজে ভাল।
অভাব, অমর প্রীতি
মিলনে বিরহ—ভীতি
বিরহ অসহ নহে; মোছ মোছ, আঁখিজল;
চেয়োনা পারশে তারে—পরশে সে হবে কাল!

কবিতাটি আমার এক বান্ধবী হস্তগত করিয়াছেন; তাঁর জানা এক মাসিকপত্রে এটি প্রকাশ করিতে চান। লেখাটি আপনার দেবরের বা অন্য কাহার অথবা কোন বই থেকে তোলা কি না-জানিলে তিনি উটি ছাপাইতে পারিতেছেন না। লেখকের নাম এবং লেখায় তিনি নাম দিতে রাজী কি না যদি অনুগ্রহ করে জানান ত বড় উপকার হয়।

দেখুন দেখি সত্যেন বাবু চল্‌বে ত?

খুব চল্‌বে। চমৎকার হয়েছে।

ভূষণ বাবু, আপনার কি মত?

আমার মত, আর্ট আপনার হাতধরা।

শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব

( ১৪ )

[ বৈশাখের নারায়ণের ৬৮০ পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি ]

ভগবদগীতায় কৃষ্ণজিজ্ঞাসা (৯)

"জীবভূতা পরাপ্রকৃতি।"

আমাদের সকলেরই জীবাভিমান আছে। আর ভাষায় জীব শব্দে চেতনাবান পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং আমরা যে জীব শব্দ বাচ্য নই, এমনও বলিতে পারি না। জীব ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ, এই ধাত্বর্থের দ্বারাও আমাদের জীবত্ব নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু গীতায় ভগবান যে জীবকে তাঁর পরাপ্রকৃতি কহিয়াছেন, তাহার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বা ধর্ম্ম আছে। সে লক্ষণটি—জগৎধারণ। "যে জীবের দ্বারা আমি এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছি, তাহাই আমার পরা প্রকৃতি"—গীতায় ভগবান ইহাই কহিতেছেন।

যাহার দ্বারা ভগবান এই জগতকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহার একটি নয়, কিন্তু তিনটি বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—১ম

জগৎ-ধারণতা; ২য় পরাত্ব; ৩য় জীবত্ব। ভূম্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার-তত্ত্ব পর্য্যন্ত ভগবানের অষ্টধা অপরা প্রকৃতি। জীব তাঁর পরা প্রকৃতি। অতএব ভূম্যাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত যা কিছু এই জীব তাহা হইতে ভিন্ন—"অন্য"। তারপর ভূম্যাদি জগতের উপাদান—এ সকলকে লইয়াই এই জগৎ রচিত। এ সকলের দ্বারাই এই জগৎগ্রথিত। ভূম্যাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলে একটা বিশাল ও জটিল সম্বন্ধের জালেতে আবদ্ধ। পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রার আশ্রিত। কারণ, রূপরসাদিতেই ভূম্যাদির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা। আবার রূপরসাদি পঞ্চতন্মাত্রা আমাদের চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের আশ্রিত। এই সকল ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেই রূপরসাদির প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা। চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় আপনারাও স্বপ্রতিষ্ঠ নহে। মনের আশ্রয় ব্যতীত ইহারা দর্শনাদি ক্রিয়া সাধন করিতে পারে না। মন আপনি আবার বুদ্ধির আশ্রিত। বুদ্ধি যতক্ষণ না খণ্ড খণ্ড ইন্দ্রিয়ানুভবগুলিকে ধারণ করে, ততক্ষণ মনের মন্তব্য বা বিষয়ের ধ্যান সম্ভব হয় না। এই বুদ্ধি আবার অহঙ্কারের অধীন। আমিত্ববোধ না থাকিলে, কে কাকে দেখে, কে কাকে ধরে, কে কাকেই বা জানে? এইরূপে ভূম্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত সকলে এক বিশাল ও জটিল সম্বন্ধজালে বাঁধা পড়িয়া রহিয়াছে। সম্বন্ধ বলিলেই একাধিক বস্তুর যোগ বুঝি। যোগ বলিলেই যোগ-সূত্রের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক হয়। যে সূতা দিয়া বহুসংখ্যক মণি একত্র গাঁথিয়া হার প্রস্তুত হয়, সেই সূতা প্রত্যেকটি মণিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া, অন্য মণিতে প্রবেশ করিয়া, তবে তাদের মধ্যে হার-রূপ সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করে। কতকগুলি মণি একটা সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই, হার প্রস্তুত করে। সেইরূপ এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার বা empirical ego পর্য্যন্ত আমাদের জীবত্বের যত কিছু উপাদান ও আশ্রয়, সকলে একটা সম্বন্ধ-জালেতে বাঁধা রহিয়াছে। কেউ কাউকে ছাড়িয়া নয়। এই

সম্বন্ধ যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই আমাদের মৃত্যু হয়। তখন এই দেহের পঞ্চভূতের সঙ্গে পঞ্চতন্মাত্রার, পঞ্চতন্মাত্রার সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের, পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে অহঙ্কারের বা আমিত্ববোধের—এই যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ এখন জীবদ্দশায় আছে, তাহা আর থাকে না। এই জন্যই লোকে মৃত্যুকে স্মরণ করাইয়া বলে—

> একদিন ত এমন হবে, এ মুখে আর বলবে না,
> এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চলবে না॥
> নাম ধরে ডাকিবে সবে, শ্রবণে তা শুনবে না।
> পুত্রেমিত্রে জগৎচিত্রে নেত্রে নিরখিবে না॥

জীবন বলিতে, এই জন্যই, দেহাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে যা-কিছু আছে, তৎসমুদায়ের একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ বুঝি। এই সম্বন্ধের সমষ্টিই জীব। এই সম্বন্ধ-সমষ্টিতেই আমাদের জীবত্ব। প্রশ্ন এই—এই সম্বন্ধের সূত্র কি? কে আমার দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধ পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুকে ধরিয়া রাখিয়া আমার এই জীবত্বকে সম্ভব করিতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরেই গীতায় ভগবান কহিতেছেন :—এ বস্তু তাঁহারই জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি।

আমাদের নিজেদের এই জীবত্ব যেমন একটা সম্বন্ধের সমষ্টি, এই জগৎও সেইরূপ একটা বিশাল সম্বন্ধ সমষ্টি ভিন্ন ত আর কিছুই নহে। স্ব-তন্ত্র, পরিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্পর্ক এই বিশ্বে ত কিছুই খুঁজিয়া পাই না। যাহা কিছু দেখি তাহাই ত রূপরসাদির একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধ মাত্র। এই প্রত্যক্ষ জগৎ যে আছে, ইহার প্রমাণ আমাদের অনুভব নয় কি? আর এই অনুভব কিসের? না জগতের রূপরসাদির নয় কি? জড় বলি, উদ্ভিদ বলি, চেতন বলি, জগতের যাবতীয় বস্তু, আমাদের অনুভবের বিষয়রূপেই প্রকাশিত

ও প্রতিষ্ঠিত। আর রূপরসাদির বিশেষ বিশেষ সংযোজন ও বিন্যাসের উপরেই কি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ব্যষ্টিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত নয়? রূপের তারতম্য, গন্ধের তারতম্য, স্পর্শের তারতম্য, শব্দের বা ধ্বনির তারতম্য, এ সকলের দ্বারাই ত আমরা এক বস্তুকে অপর বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া জানি। ক-নামক পদার্থের রূপরসাদি পরস্পরের সঙ্গে যে ভাবে সম্বদ্ধ, খ-নামক পদার্থে এগুলি অন্যভাবে অন্যবিধ সম্বন্ধেতে প্রকাশিত, এই জন্যই ক যে খ নহে, ইহা আমরা বুঝি। আর ক'এর ও খ'এর ভিতরকার সম্বন্ধের দ্বারা যেমন ইহাদের পরস্পরের ব্যষ্টিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বুঝি; সেইরূপ আবার ইহাদের বাহিরের সম্বন্ধের দ্বারা ক যে খ নয়, ইহাও বুঝি। যেখানে এক বস্তু অপর বস্তু নয় বলি, সেখানেও এই না-'এর ভিতর দিয়াই ইহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ যে আছে, ইহা প্রত্যক্ষ করি ও স্বীকার করিয়া লই। অতএব সাম্যের দিক দিয়াই দেখি, আর বৈষম্যের দিক দিয়াই দেখি; হাঁ'-এর দিক দিয়াই ধরি আর না'-এর দিক দিয়াই ধরি; যে দিক দিয়া, যে ভাবেই এই জগৎকে জানিতে যাই না কেন, একটা বিশাল সম্বন্ধ-জালের প্রত্যক্ষ লাভ করিয়া থাকি। আমাদের নিজেদের আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব যেমন একটা সম্বন্ধের সমষ্টি মাত্র, সেইরূপ আমাদের বাহিরে যাহা কিছু আছে বলিয়া মনে করি, তাহাও একটা বিশাল ও জটিল সম্বন্ধ-সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কতকগুলি সম্বন্ধের আশ্রয়ে আমাদের ব্যক্তিত্ব ও জগতের জগত্ব উভয়ই প্রতিষ্ঠিত। আর আমাদের নিজেদের আন্তরিক অভিজ্ঞতার আলোচনা করিয়া যেমন এই সম্বন্ধের সূত্র কি, এই জিজ্ঞাসার উদয় হয়; সেইরূপ এই বহির্জগতের যাবতীয় অভিজ্ঞতার ও অনুভবের আলোচনা করিতে যাইয়াই—এই সকল সম্বন্ধের সূত্র কি, সেই একই জিজ্ঞাসারই উদয় হইয়া থাকে। আর এই দ্বিবিধ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে যাইয়াই গীতায় ভগবান তাঁর এই জীবাখ্যা পরা-প্রকৃতি-তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আর ভগবান তাঁর এই পরা-প্রকৃতিকে জীবাখ্যা দিলেন এই জন্য যে জীব ধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ। আর প্রাণী মাত্রেই চেতন-লক্ষণযুক্ত। যে বস্তুর দ্বারা এই জগৎধৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা অচেতন জড়বস্তু নহে, কিন্তু সচেতন প্রাণ বস্তু। অর্থাৎ আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতাতে সম্বন্ধ-মাত্রেই যেমন আমাদের জ্ঞান-গ্রাহ্য ও জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ এই বিশ্বের যে বিশাল সম্বন্ধ-জাল তাহাও জ্ঞানগম্য, জ্ঞানপ্রতিষ্ঠ। জ্ঞানেতেই এই জগতের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু কার জ্ঞানে? আমরা যাহাকে আমাদের জ্ঞান বলি,—"আমি জানি" এই প্রত্যয়ের উপরে যে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, তাহাতে যে এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত নয়, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। প্রথমতঃ প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা নূতন নূতন বস্তু ও বিষয় জানিতেছি। জ্ঞানমাত্রেই বস্তুতন্ত্র বস্তুর অধীন; বস্তুসাক্ষাৎকারে উৎপন্ন হয়। যাহা এখন জানিতেছি, পূর্ব্বে জানি নাই; তাহাও ত বস্তু, অবস্তু নহে। আর বস্তু হইলেই তাহা আমার জ্ঞানগম্য হইবার পূর্ব্বেও ছিল, আমার জ্ঞান-সীমার বাহিরে গেলেও থাকিবে, কারণ অবস্তু হইতে বস্তুর উৎপত্তি হয় না, হইতেই পারে না। সুতরাং এই জগতের সকল পদার্থ আমার জ্ঞানেতে প্রতিষ্ঠিত নহে, হইতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ আমি ঘুমাইয়া থাকি, তখনও ত এই জগৎ থাকে। তখন ত আর আমার জ্ঞানেতে ইহার স্থিতি হয় না, আমি যে তখন অজ্ঞান। তৃতীয়তঃ যাহাকে "আমি" "আমি" বলিয়া থাকি, যাহা ভূম্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কারতত্ত্ব পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, এই দেহে যার স্থিতি, এই সকল ইন্দ্রিয় যার করণ, দেহেন্দ্রিয়াদির সম্বন্ধেতে যে জড়িত, সেই "আমি" আমার জন্মের পূর্ব্বে ছিল বলিয়া জানি না। মরণের পরপারে থাকিবে কি না, বুঝি না। অথচ আমার জন্মের পূর্ব্বে এই জগৎ ছিল—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি যুগ ধরিয়া ছিল, আর আমার মৃত্যুর পরেও থাকিবে। সুতরাং আমার

যে জ্ঞান এই আমির বা অহঙ্কারের বা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা empirical ego'র সঙ্গে জড়িত ও তাহার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, সেই আমির জ্ঞানেতে এই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা নহে, হইতেই পারে না। এই বিশ্বের প্রতিষ্ঠা কেবল তেমন জ্ঞানেতেই সম্ভব যাহা চিরন্তন, যাহা নিত্য-জাগ্রত, যাহা অনাদি ও যাহা অনন্ত। সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারাই কেবল এই জগৎ বিধৃত হইয়া থাকিতে পারে। আর ভগবান গীতায় যাহাকে তাঁর জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন তাহা এই অনাদ্যনন্ত, অখণ্ড ও অদ্বৈত জ্ঞানবস্তু। আমরা নিজেদেরে যে জীব বলিয়া জানি, এই জীব যে তাহা হইতে "অন্য" ইহার কি আর কথা আছে ?

তবে ভগবানের এই পরাপ্রকৃতিকে যে জীব বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ এই যে জীব বলিতে আমরা যাহা সচরাচর বুঝিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে ইহার অনেক সামান্য ধর্ম্ম আছে। এই জগতের জীব সচেতন, ইহার জ্ঞান আছে ; কিন্তু কেবল এই জন্যই যে পরাপ্রকৃতিকে জীবাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে। কারণ এই জ্ঞান-ধর্ম্ম যেমন জীবের আছে, সেইরূপ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বা ভগবানেরও ত আছে। সুতরাং এই জ্ঞানসামান্য হইতেই যে ভগবান তাঁর এই পরাপ্রকৃতিকে "জীবভূতাং" বলিয়াছেন, এমন মনে করা যায় না। জীবের সঙ্গে এই পরাপ্রকৃতির অন্য কোনও গুণসামান্য অবশ্যই আছে,—এমন কিছু জীবেতে আছে, যাহা ব্রহ্মেতে বা ঈশ্বরেতে বা ভগবানেতে নাই, কিন্তু তাঁর এই পরাপ্রকৃতির মধ্যে আছে, আর তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ইহাকে জীবাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সে বস্তুটি কি ?

গীতায় ভগবান তাঁর "জীবভূতা" পরাপ্রকৃতির যে মূল লক্ষণটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই মধ্যে এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। সেই লক্ষণটি—"যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" যাহার দ্বারা এই জগৎ ধৃত হইয়া আছে। দেখিয়াছি যে এই জগৎ বলিতে আমরা রূপরসাদির সমষ্টি বুঝি। আর রূপরসাদি যে

আছে ইহার প্রমাণ রূপরসাদির জ্ঞান। যার জ্ঞানেতে জগতের নিখিল রূপরসাদির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভগবানের পরাপ্রকৃতি, ইহাই গীতার কথা। কিন্তু রূপের প্রামাণ্য দর্শনে, শব্দের প্রামাণ্য শ্রবণে, গন্ধের প্রামাণ্য আঘ্রাণে, জড়জগতের প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা চক্ষুশ্রুতি প্রভৃতিতে। চক্ষুশ্রুতি বলিতে এখানে এই শরীরের দর্শণেন্দ্রিয়াদিকে নির্দ্দেশ করিতেছি না, কিন্তু দর্শনাদির শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছি। এ সকল ইন্দ্রিয়কে নহে, কিন্তু তাহাদের গুণাভাসকেই লক্ষ্য করিতেছি। ফলতঃ আমাদেরও চক্ষুর গোলকেই যে রূপ দেখে, বা কর্ণপটহেই যে শব্দ শোনে, তাহা ত নহে; এসকল রূপাদির জ্ঞানলাভের করণ বা যন্ত্র মাত্র। যে দেখে সে চক্ষুর অন্তরালে আছে, সে "চক্ষুষ-শ্চক্ষুঃ"। যে শোনে সে শ্রুতির অন্তরালে আছে—সে যে "শ্রোতস্য শ্রোত্রং"। সুতরাং এই স্থূল জড় চক্ষুরাদি করণের সাহায্য ব্যতীত যে রূপাদির জ্ঞানলাভ অসাধ্য বা অসম্ভব, এমন কথা বলিতে পারি কি? তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে স্থূল হউক, সূক্ষ্ম হউক, কোনও না কোনও বিশিষ্ট করণ গ্রহণ না করিয়া, রূপরসাদির জ্ঞান যে সম্ভব ইহাও বলা যায় না। অতএব ভগবান তাঁর যে জীবভূতা পরাপ্রকৃতি দিয়া এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছেন, তাহা যেমন জ্ঞানবস্তু, বা চিদ্বস্তু, সেইরূপ চিদিন্দ্রিয়সম্পন্নও বটে। দেশকালের সীমাতে আবদ্ধ, উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মাধীন, জড় উপা-দানে-রচিত চক্ষুরাদি করণ তাঁহার নাই; কিন্তু দেশকালাতীত, উপচয়-অপচয়-ধর্ম্মবিহীন, নিত্যজাগ্রত, রূপরসাদিগ্রহণ-ও-ধারণক্ষম চিদিন্দ্রিয় অবশ্যই আছে। না থাকিলে, এই জগতের রূপরসাদির প্রামাণ্য ও প্রতিষ্ঠা থাকে না। এসকলকে অলীক, মায়িক, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও কেবল মনকেই চোক ঠা'র দেওয়া হয়, মূল সমস্যার মীমাংসা হয় না। কারণ, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, এই মিথ্যারই বা উৎপত্তি হইল কোথা হইতে? সত্য হইতে মিথ্যা সম্ভব হয় না, হইতেই পারে না। জগৎ মিথ্যা

হইলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে—জন্মাদ্যস্য যতঃ বলিয়া জগতের অনাদি-আদি কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সে কথা এখানে তুলিব না। গীতা জগতকে প্রবাহরূপেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবানের জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি এই জগৎপ্রবাহ ধারণ করিয়া আছেন। কিসের দ্বারা? না তাঁর অনাদিসিদ্ধা, নিত্যপ্রবুদ্ধা স্বাভাবিকী ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা। এই প্রশ্নের আর কোনও উত্তর সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর কেবল জ্ঞান-সামান্যতা হেতু নহে, কিন্তু জ্ঞানসাধক ইন্দ্রিয়শক্তির সামান্যতা নিবন্ধনও আমাদের সঙ্গে ভগবানের এই পরাপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যহেতুই আমরা যেমন জীব, তাঁহার মধ্যেও সেই জীবধর্ম্ম আছে। এই কারণেই ভগবান তাঁর এই পরাপ্রকৃতিকে "জীবভূতাং" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করিয়াছেন।

এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতির প্রধান লক্ষণ এই যে ইহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। "যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"—যাহার দ্বারা এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে, তাহাই আমার পরাপ্রকৃতি। প্রশ্ন উঠে কখন হইতে ধারণ করিয়া আছে? এই জগৎ জন্য বস্তু, ইহা কার্য্য। ইহার পশ্চাতে উপযুক্ত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বৃক্ষের মূলে যেমন বীজ থাকে, জগতের মূলে সেইরূপ একটা না একটা জগদ্বীজ অবশ্যই আছে। না থাকিলে, এই জগতের উৎপত্তি হইল কোথা হইতে, কেমনে? বীজ হইতে লতা সকল উৎপন্ন হয়, তার পর সেই লতাকে ধরিয়া রাখে কোনও গাছ বা অন্য কিছু; লতার বীজ এক, আশ্রয় অন্য। এই জগৎ সম্বন্ধেও কি তাহাই বলিব? জগতের বীজ এক; তার আশ্রয় অন্য? আপনার বীজ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তারপরে ভগবানের পরাপ্রকৃতি তাহাকে ধারণ করিয়াছে? ভগবানের এই জীবভূতা পরাপ্রকৃতি কি জগদুৎপত্তির পরে জগতকে ধরে, না নিত্যকালই তাহাকে ধরিয়া আছে? জগৎকারণ কর্ম্ম কালেতে আরম্ভ হয়, না অনাদিকৃত? ভূম্যাদি অপরাপ্রকৃতির

উৎপত্তি কালেতে হয়; এই জন্যই এগুলিকে ভগবান তাঁহার অপরাপ্রকৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু যে জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি জগৎ-ধারণ করিয়া আছে, তাহা নিত্য। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে তাহাই জগদ্বীজকেও ধরিয়া রাখিয়াছিল। এই বীজ বস্তুটি কি? জগতের রূপ যাহাতে নিত্যসিদ্ধ হইয়া আছে, তাহাই ত জগতের বীজ। বটগাছের পরিপূর্ণ ধর্ম্ম ও আকার বটবীজের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ। বটগাছের সমগ্র জীবনেতিহাসের অভিনয়টি ঐ ক্ষুদ্রতম বীজের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised হইয়া আছে। সেই নিত্যসিদ্ধ ইতিহাসটিই দেশকালের রঙ্গমঞ্চে তিলে তিলে ফুটিয়া উঠিয়া, বটগাছের পরিণাম বা অভিব্যক্তি সম্ভব ও সাধন করিতেছে। ভগবানের পরাপ্রকৃতি যে জীবতত্ত্ব, তাহাও সেইরূপ সমগ্র বিশ্বের অভিব্যক্তির ইতিহাসটি আপনার মধ্যে নিত্যসিদ্ধ বা eternally realised করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপের অন্তর্গত যে তত্ত্ববস্তু হইতে এই সৃষ্টিধারা প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাই তাঁহার জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতি। তাহারই দ্বারা তিনি এই জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই জীবাখ্যা পরাপ্রকৃতির মধ্য দিয়াই এই জগৎপ্রবাহের বা সৃষ্টিপ্রবাহের সঙ্গে তাঁর যা-কিছু সম্পর্ক। এই জন্য তাঁর এই জীব-প্রকৃতি পরাপ্রকৃতি হইয়াও তটস্থা, অন্তরঙ্গা নহে। আর এই তটস্থা যে জীবপ্রকৃতি ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই, মনে হয়, গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অবতার-তত্ত্বের অবতারণা হইয়াছে। এই জীবপ্রকৃতিকে না বুঝিলে গীতার অবতারবাদও বুঝা যায় না, আর গীতার যে প্রধান কথা—পুরুষোত্তম-তত্ত্ব, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারা যায় না।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

---

# রাণী

[ কথা-চিত্র ]

বিলাত হইতে ফিরিয়া সবই কেমন শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনে হইতেছিল যেন এ কোন্ নূতন জগতে আসিলাম। লোকগুলা সবই জানা-জানা, অথচ যেন কেমন একটা কুয়াসায় ঢাকা, কেবল দৃশ্যগুলি চিরপরিচিত ও বৈচিত্র্যবিহীন। সে কুয়াসার যবনিকার ভিতর হইতে জানা-অজানার মাঝে কেমন যেন মনে হইতেছিল; নূতনের সে সজীবতা নাই, সবই কেমন পুরাতন, তিক্ত, বিস্বাদ ও নির্ম্মম।

বিলাতে বিলাতী সাহিত্যের মধ্যে ডুবিয়াছিলাম। ইব্‌সেন্, নিয়েট্‌সে, ও কাংড়ার নূতন সাহিত্য-স্বষ্টির মধ্যে নিজেকে মিলাইতে চাহিতাম। বিলাতী জীবনের সঙ্গে বিলাতী সাহিত্যের মিল দেখিতাম না। আমার জীবনকে নিয়েট্‌সের কল্পপন্থা ও ইব্‌সেনের বস্তু-পন্থার দিক দিয়া মিলাইতে চাহিতাম। সাহিত্য-চর্চ্চা করিতাম, নানান রকম খেলায় যোগ দিতাম। জীবনটাকে ভাল করিয়া জীবনের মত করিয়া উপভোগ করিতাম। ভারতের তটের সহিত যেন কোন স্মৃতিই জড়িত ছিল না, কোন ঢেউই সেখানে আছাড়িয়া পড়িত না। তার আর আমার মাঝে সাত সমুদ্র ও তের নদী বহিত।

মাতার অপার স্নেহ কিন্তু সে পারে আসিয়া তেম্‌নি ঢেউ তুলিত, সে কল-কোলাহলের সঙ্গে পিতার স্নেহ-দৃষ্টি ও আশীর্ব্বাদ তেম্‌নি আমার শিরে স্পর্শ করিত।

কিন্তু কোথায় হৃদয়ের নিভৃত কোণে কি এক অব্যক্ত বেদনা লুকাইয়া ছিল, সে ব্যথায় মাঝে মাঝে বুকের ভিতর ঝন ঝন্

করিয়া উঠিত। প্রাণ কেমন হইয়া যাইত, অবসাদ আসিত, জীবনটা যেন ব্যর্থ বলিয়া মনে হইত। মা বুঝাইতেন, পিতা চক্ষের সম্মুখে আদর্শ ধরিয়া দিতেন...শাস্ত্র উপদেশ দেখাইতেন, আমার স্বেচ্ছা-চারিতার বিষময় ফল বুঝাইতে চাহিতেন...আমার সেসব ভাল লাগিত না। তাঁহাদের স্নেহের দাম থাকিতে পারে, কিন্তু কথার কোন মূল্যই নাই বলিয়া মনে হইত।...মানুষের জীবন কি পদে পদে শাস্ত্র-উপদেশ দিয়া গণ্ডী টানিয়া চলিবার জন্য...এ কথা আমার ভাল লাগিত না...লাগেও না। পিতা বুঝাইতেন, কাব্য-শিল্প-চর্চ্চায় মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়; অর্থের প্রতি আকর্ষণ থাকে না, অর্থকরী বিদ্যা না হইলে সে বিদ্যায় কোন সার্থকতা নাই। মনুষ্যজন্মের সার্থকতা শুধু কুবেরের কিঙ্কর হওয়া; সকল বিদ্যা, সকল কর্ত্তব্য, সব ধর্ম্ম ওই যক্ষরাজের চরণে। জীবন ওই খানে উৎসর্গ কর, ওই ত শান্তি, ওই ত তৃপ্তি! বুঝিবা ওই তাঁদের মুক্তি। এত টাকা খরচ করিয়া বিলাত পাঠাইয়া লেখাপড়া আইন শিখাইয়াছি শুধু ওরই জন্য! না হইলে সবই ভস্মে ঘি!

ভাই ভগ্নীরা চিরকালই পর ছিল, তারাও আমার আপনার নয়। আমি ত কাহাকেও আপনার করি নাই। মাঝে মাঝে চিঠী পাইতাম, তাহার উত্তর দিতাম না...মনে হইত ছলনা করা ভাল নয়। তাহারা বলিত, আমি তাদের ভালবাসি না।...বুঝি নিজে-কেই নিজে ভালবাসিতাম না।

বাকী বন্ধুরা: তাঁহারা সেই ষ্টেসনে গাড়ীর ধূমের সঙ্গে সঙ্গে সব স্মৃতি ধোঁয়ার মত বাষ্পাকারে রচনা করিয়া লইয়াছেন। তাঁদের ধার পথেই শোধ হইয়া গেছে।

বৈঠকে ও সভায় আমার স্থান নাই, সেখানে কেবল চশমার আড়ালে সবাই কথার বাচ খেলে।

এক বন্ধন সাহিত্যের...তাও ছিল না। যে দেশে জীবনের সঙ্গে মিল নাই, সে দেশে আবার সাহিত্যের বন্ধন। রসিক বন্ধুদের

কল্পনা ও অনুভূতির চরম সীমা, রবিবাবুর গান, কবিতা, যৌবনের প্রলাপ বার্দ্ধক্যে জীবনের উপর চাপান, আর ধোঁয়ায় নাটকের স্ফূর্তি...রক্তমাংসের ভিতর দিয়া আসল কথা বলিতে যাওয়া, অর্ব্বাচীনতা, সে ত প্রবৃত্তির স্তরের কথা, ও ত বাস্তব ও কিছু না! জীবন শুধু খেলা, ছুটী, আনন্দ...অহোরাত্র চাকায় পেষিত হইয়া জীবনের অস্থি পঞ্জর যে জগন্নাথের রথের তলে পড়িয়া পিষিয়া ধূলায় মরিতেছে, সে সুরের ক্রন্দন তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না, সে বাজনা তাদের বুকের তারে বাজে না। সব-হারা-দেশ, যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লইতে অক্ষম, ওই একটু ধোঁয়ার স্ফূর্তিতে জীবনের চরিতার্থতা সাধে; সব-পেয়েছির-দেশের কথা ভাবে, এত জ্বালার, যাতনার ভিতর একটুও ত শান্তি চাই, বটে...হাহা হা!...কাজেই আফিমখোরের মত নেশায় ভোর হইয়া থাক! আয়র্লণ্ডেও তাই কবি য়েটস্ জন্মায়, হৃদয়ের চির আকাঙ্ক্ষার দেশ রচে, জলের ছায়ায় দিশে হারায়, বলে আমরা রূপক রচনা করিতেছি। নাটককার সিন্‌জে জন্মায় রসিকতা করে। ম্যাটার্লিঙ্কের অনুকরণ করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দেয়, জীবনকে আনন্দের মত বেশ উপভোগ করে; তাই এদেশের আরাম-কেদারায় রবীন্দ্রনাথ জন্মায়। জীবনের সঙ্গে ত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, সাধনাও নাই। কবীরের দোঁহা পড়িয়া অসীমকে কুক্ষীতলে চাপা দিয়া সীমা ও অসীমের মাঝে ধোঁয়ার সিঁড়ী তৈয়ারী করে...হাফেজ পড়িয়া গোলাপ রাঙাইয়া তুলে; তাদের আর্ট যে 'স্রষ্টা' আমির আর্ট: খেয়াল। ইব্‌সেন, নিয়েট্‌সে, কাংড়ার নামে একটু শিহরিয়া উঠিবেন বৈকি! এই সব সাহিত্যিক দলের চাল-চলন দেখিলে, তাহাদের সাহিত্যের ধারা পড়িলে, অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইত। জীবনকে বাদ দিয়া ঝির-ঝিরে গতিয়ের মত যারা মুক্তা-শুক্তির আলোরের তলে ঝিঁঝিঁর ডাকে মৌজ হইয়া কাব্য উপভোগ করে, রসের কাজল চোখে টানিয়া দুনিয়াকে রূপের মানসীতে গড়িয়া তুলে...ওদিকে চক্ষের

সম্মুখে জ্বালা, বিস্ফোটক, মড়ক, রক্তারক্তি, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ। আর তাহারা বার্দ্ধক্যে যৌবনকে ডাকিয়া আনন্দের মূল্যে দুর্ভিক্ষে দান করে। শীর্ণ বিশীর্ণ কঙ্কালসার নরনারী ও মানবশিশুর ক্ষুধা-বিদ্যুতের রোস্‌নিতে ভাজিয়া বিশ্বহিতের চূড়ান্ত দাবী করে··· ধিক্!...তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই!...সত্য যদি নির্ভীক চিত্তে বল তবে তাহা তাদের নিকটে অসত্য ও ঢিল ছোঁড়ার মত হইবে। তাহারা বলে ছেলেরা যেমন ঢিল ছুঁড়ে, হাঁসকে মারিবার জন্য তাড়া করে, তেমনি কাব্য-সাগর-জলে রাজহংসের মত ছেলেদের ঢিলের ঠ্যালায় মাথা ডুবাইয়া পালাইতে হয়। একবার করিয়া মাথা তুলি ছেলেরা ঢিল ছোঁড়ে, আবার জলের মধ্যে মাথাটা ডুবাই। মাথা বাঁচাইবার আর উপায় নাই। হারে স্ত্রী-ভাবাপন্ন স্ত্রৈণ দেশ, নির্ব্বোধ মেষের দল! ধিক্! ধিক্!...মানুষ চায় জীবন! আমি চাই জীবন। পুরুষোচিত কণ্ঠে আবাহন! না পারি ছলনা করিব না।...ছলনা করিয়ো না!!

চিত্র ও ভাস্কর্য্য দেখিয়া হাসিয়া মরিতাম...কোথায় বা সাদৃশ্য কোথায় বা বর্ণভঙ্গিমা আর বর্ণিকাভঙ্গ...কোথায়ই বা ভাব আর কোথায়ই বা সাধনা। বরাহমিহির ও শুক্রনীতির পুরাণ ছন্দ তাল লইয়া চাপাইতে চায় এই যুগে। বহু কেমন করিয়া এক হইলেন, রূপে কেমন করিয়া ভেদ আসিল, আরাম কেদারায় বিদ্যুতের পাখার হাওয়ায়, আনারসের সরবতের সঙ্গে এ সব বেশ জানা যায়। তাহারা ত জীবনের সঙ্গে মিলাইবার কোন কারণ দেখে না, বুঝে না যে যুগে যুগে মাপকাঠি মানুষ রচনা করিয়া লয়, তার প্রয়োজন মত। উপনিষদ্, বরাহ ও শুক্রের এ কাল নয়, 'বৃক্ষইব স্তব্ধো' বলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলে না। ভাঙ্গা-ভাঙ্গি শুধু ওই অজান্তার আভঙ্গ ও ত্রিভঙ্গ মুরারীর বাঁকা নয়নে নয়, প্রাণের ভাঙ্গা-গড়া আর এক রকম! ইহা তাদের বিকৃত শিল্পী-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না...তাহারা একদিকে শাস্ত্রের বোঝা ঘাড়ে করিয়া চাপে

চেপ্‌টা হইয়া যায়, পাশ্চাত্য শিল্পের কত খাদ তাই কষ্টিপাথরে দাগ টানিয়া দর কষিতে বসে। এক অচলায়তন ভাঙ্গিয়া, আর এক বিচল-আয়তন করিতেছে, সেখানে বোধ হয় পুরুষ মানুষ কেহ নাই। সেখানে মনু পরাশরের ছাঁদ মারা গিয়া মোগলাই সংস্কৃত হরফে পেশোয়াজের "বাঁকা ছাঁচে" সত্যং জ্ঞানং অনন্তং গড়িয়া উঠিতেছে, নয় পূর্ব্ব সমুদ্রের দেড় চক্ষুর মাথা হইতে পায়ের দিকে নামিয়া আসা অপূর্ব্ব ছাঁচে নিজেদের 'ওরিয়েণ্ট্যালিসমের' (প্রাচ্যের) শ্রীছাপ অঙ্কিত করিতেছে। জাপানী সীতা, আর ওই দেড় চক্ষুর অনুকরণে গৌরচন্দ্র—তেড়িকাটা বিশ্বামিত্র! কল্পনা আর পরিকল্পনার জ্বালায় প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিয়াছে।...হায়ে হতভাগ্য বাঙলা দেশ! এক বহু হইব বলিয়াই বহু হয় নাই, নিজের মধ্যে ভাব ও রসে সামঞ্জস্য করিতে গিয়া বহু হইয়াছে। সৃষ্টি অত সহজে হয় নাই যে হাতে-পোঁতা সালের বাগানে বসিয়া উপনিষদের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া সাজিয়া গুজিয়া রং করা কাচের ঘরে ব্রহ্মকে ডাকিলাম, আর আমার থানাবাড়ীর রেয়ত অমনি হাজির হইয়া, 'অসতো মা' আরম্ভ করিল।...শুক্রনীতি শিল্প-পুস্তক নয়, তাহাতে যাওবা আছে তা সেই যুগের জ্ঞানের নিকৃতিতে ওজন করিয়া তাহারা রচনা করিয়াছিল, তাহাকে কোন সাধারণ জ্ঞান-বিশিষ্ট মানুষ শাস্ত্র বলিয়া প্রামাণ্য খাড়া করিতে পারে না। সে তাহাদের সেই যুগের, সেই সময়ের—এ যুগ সে সামঞ্জস্যে দাঁড়াইয়া নাই। নিজেকে পূর্ণ করিতে গিয়া অবিরাম ভাব, অপূর্ণ ও পূর্ণতার দ্বন্দ্বের মাঝে সৃষ্টি বহু হইয়া উঠিতেছে। তাই হয়...তোমার আমার প্রাণের ভিতর অপূর্ণ ভাব অভাব, নিজে সৃষ্ট হইয়া তাহাই যখন আবার পূর্ণতা লাভ করে, ভাবে ও আকারে, রূপে সামঞ্জস্য করিয়া ফুটিয়া উঠে, তখনই সৃষ্টি হয়। সেই রকমই মহাবিশ্বের স্রষ্টার বুকে ভাব অভাবের পূর্ণতায় সৃষ্টি চলিয়াছে। আগে তা বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি।···বাঙ্‌লার শিল্পী ভাবে, ছবির ছয় অঙ্গ দোলাইলেই হইল। তারা ভাবে

পুরুষোচিত বাহু না লতাইলে মাংসপেশিগুলাকে অক্ষম হীনবল না করিলে জোরপূর হয় কি করিয়া...ভাবের দোলা দেয় কেমনে ?... ছবির ছয় অঙ্গের কোনটারই সামঞ্জস্য নাই, আছে কেবল অঙ্গের ব্যঙ্গ। অথচ তাহারা ভাবে যে তাহাদের প্রতিভা আছে বলিয়াই, তাহাদের উপর দুনিয়াটা এমন করিয়া চোখ চাহিয়া থাকে, হিংসায় ফাটিয়া মরে...দুর্ভাগ্য শিল্পী বুঝে না যে, একদেশী অনুকরণ প্রতিভাই জগতের শ্রেষ্ঠত্ব নয়।...সামঞ্জস্যই শ্রেষ্ঠতম, মনুষ্যত্ব। সামঞ্জস্য ছাড়া সৃষ্টি হয় না।...মাটি, মা যাকে বুক পাতিয়া আশ্রয় দিলে না, দেশ যাহাকে আপনার বলিয়া বরণ করে না,...তাহার উপর হিংসা করিবার কিছুই নাই...বিদেশী রসে পুষ্ট পরগাছার আদর মাটির খাঁটী ছেলে করে না। সে জানে, এই বাঙলার ঘাসের বনে এমন মানুষও আছে, যে জগতে কাহাকেও হিংসা করে না, শত শত মণি-রত্ন-খচিত বিদেশের হিরণ কিরীটকে হিংসা করা দূরে থাক, তুচ্ছ ধূলি হইতে ধূলি বলিয়া পদতলে দলিয়া যাইতে পারে; ছার মণি কাঞ্চন, আর বিদেশের রত্নময় ভূষণ! সে

'কত রূপ স্নেহ ক'রে দেশের কুকুর ধরে
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া...'

হায় শিল্পী! জড় মাটিতেই ফুল ফোটে, স্বপ্ন-ঘুম-ঘোরে, লাল পরী, নীল পরী ও জরদা পরীর জরদা উড়াইলে, মাটির উপরের জীব হইতে পারে,...মানুষ নয়।...কেহ চিত্রকলার সহিত কাব্যের মিল দেখায়, কেহ দুমুঠি ডালিম ফুলি আর রঙের ধূলি ছড়াইয়া বলে, বিংশ শতাব্দীর বেদ রচনা হইল। আমি তাহার উদ্গাতা, আরসোলাও বলে আমি চকোরপাখী হইলাম, এইবার চাঁদের চুমা খাইব। কেহ বা আবার নিজেকে হরিণের সঙ্গে মিলাইয়া হরিণের গায়ের কালো দাগের খেলায় বিশ্বকর্ম্মার লীলা বুঝায়। আরে মূর্খ, মানুষ যে হরিণ নয়, এটাও কি বুঝিতে হইবে।

দুর্ব্বল দাসসুলভ প্রবৃত্তির ধারে যে নারীর সম্মান অসম্মান লইয়া

খেলা করিতে আসে, তাহারা আবার শ্লীল অশ্লীলের বিচার করে, হিংসায় জ্বলিয়া ভদ্রগৃহস্থের মেয়েকে রসিকতা করিয়া ঢাক পিটাইয়া যে কাব্য জাহির করে, ভাবে দুনিয়া ত আমারি পদতলে, আমিই সেরা গাইয়ে ও বাজনদার, যত ফিঙে, বাবুই, বুলবুল, হাঁড়িচাঁচা, সবার সুরের ধাঁচাই আমার গলায়, আমি খঞ্জনের মত কাব্যের নাচন-তাল দিতে পারি। বাঙলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় সেও নাকি কবি।...ইহাও ছাপে, মাসিক পত্রের সম্পাদক গৌরব করে, কবির কলমের উত্তরাধিকারী হইয়া কবিতার সপিণ্ডকরণ করে। মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত দাসের রাজ্যে স্ত্রীলোকের উপর রসিকতা না চালাইলে, তর্জ্জমার দেশে পুরুষত্ব লাভ হয় কি করিয়া। ছিঃ...কুব্জ-পৃষ্ঠ নত-দেহ, বাঙলার শিল্পী মাথা তুল, সরল হও, নিজের স্বরূপ জান, আপনাকে আঁক, তবে পূর্ণতা আসিবে।

সাহিত্যের বৈঠকে এইসব রসিক সাহিত্যিক বন্ধুরা যাঁরা চশমার ভিতর দিয়া ত্যাড়ছা চোখে এ্যাড়ছা দৃষ্টিদানে রঙের ধোঁয়ায় জাপানী-ফানুষ সাবানের জলে রচে, বাজারে ঘোলের সরবৎ গলায় ঢালিয়া চান্‌কা মারিয়া তান্‌কা গায়, তাহাদের কথায় বঙ্কিমবাবুর অপক্ক কদলীর কথা মনে পড়িত। কত তর্ক উঠিত, তর্ক করিতাম, তাহারা বলিত আমি অশিক্ষিত, অসভ্য, আমার না বুঝিবার ক্ষমতা অসীম। দেশের জীবন ও সাহিত্যের এই চমৎকার মিল দেখিয়া হাসিয়া মরিতাম। যন্ত্রণা হইত...তাহারাও আমার আপনার হইত না, আমি ত তাহাদের মত মন মুখ দু'রকম করিতে পারিতাম না, পারিও না... বাঙলার এ বহুরূপী সাহিত্যের বাজারে আমার স্থান ছিল না, সেখানেও আমার স্থান মিলিত না। ভাবিতাম কূয়ার ব্যাঙ, সমুদ্রের বিশালতা বুঝিব কি করিয়া। এমনি করিয়া জীবনের ধারা বহিতেছিল...শুধু অতৃপ্তি, অশান্তি, জ্বালা।...

স্থান ছিল শুধু বৈঠকে আর...আর এক জায়গায়...সে জ্বালা নিভাইতে চাই, ডুবাইতে চাই, সে তীব্র পিপাসা মিটে না, সাহিত্যের

রসে ডুবিয়াও শান্তি মিলিত না,...হায়! সে মুমূর্ষুর দাহ কি উপশম হইবার। পঙ্কের ভিতর মুখ গুঁজড়াইয়া বেড়াইতাম। বৈঠকের পর চক্ষু রক্তিম করিয়া সকল দুঃখ ভুলিতে চাহিতাম। তারপর বিলাস...নেশায় বিভোর হইয়া সুখ-স্বপ্নে ভাসিতাম। হো! হো! সুখের কত জ্বালা! সে কি সুখ? না স্বপ্ন?

প্রভাতে বুঝিতাম, দীর্ঘনিশা তম অন্ধকারেই কাটাইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা লইয়া মাংসাশী জীবের মত, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চায় কাটিয়াছে,... ক্ষুধিত পাষাণের মত পাষাণেই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা হাঁ করিয়া থাকিত। সবই জানিতাম, সবই বুঝিতাম, কিন্তু করিব কি,...রাত্রির শূন্যতা কে পূরণ করিবে...যাহারা শূন্য হইয়া আছে, বুঝি বা তাহারাই! সে শূন্যের মাঝে এক একবার কার রূপের আভা আসিত, চাহিতে নয়ন ঝলসিয়া যাইত, বুঝিয়াও বুঝিতাম না...সে যেন জাগিয়া স্বপ্ন!...একা, একা, বড় একা...এত অর্থ, এত বিলাস, কই ভোগের সুখ কই! তৃপ্তি কই, ভোগই বা কই! ভাবিতাম স্পর্শই সুখ, স্পর্শই প্রণয়, স্পর্শই ইন্দ্রিয়ের শেষ তৃপ্তি, কিন্তু সে রূপকে ত ধরিতে পারিতাম না, তৃপ্তিও মিলিত না, স্পর্শের লালসায় প্রাণ জ্বলিয়া মরিত।

সে দিন নেশার অবসাদের পর, কিছু ভাল লাগিতেছিল না। সারা নিশা পানপাত্রে তুফান উঠিয়াছিল, পাত্র ছাপাইয়া ভাসাইয়া গিয়াছিল...সুখ ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছিল...কিন্তু শিরে তার দুঃখের জ্বালাময়ী মুকুট...কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়া সুখ যে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়...সে দিন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অবসাদ-পীড়িত দেহভার লইয়া কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মনে হইতেছিল, বড় একা, বড় ফাঁকা, সবটাই খালি। সাদাচোখে বারাঙ্গনার অঙ্গনে সে লীলা খেলিতে কেমন মনে হইল। মর্ম্মহীন ইন্দ্রিয়-জ্বালায় প্রাণ জ্বলিয়া মরিতে লাগিল। কোথায় তাহাদের ইন্দ্রিয়, সেত শুধু আমার মাংসের ক্ষুধা তপ্ত পাষাণে, শুখাইয়া জ্বলিয়া

মরে। সে দুঃখের অপেক্ষাও ভীষণ ভয়াবহ। পথে বাহির হই-লাম। পথের পর পথ ঘুরিতে লাগিলাম। জনসঙ্ঘ যেন এক তুলিকার বর্ণবৈচিত্রে রঙিন হইয়া মিলাইয়া আছে। আমিও সেই জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গেলাম। অসংখ্য অসংখ্য মুখ, অসংখ্য অসংখ্য ভাব।...

সেই কোলাহলময় সাগরলহরীসম নরমুণ্ড দেখিয়া হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভাব জাগিতেছিল...বুঝিতে পারিতেছিলাম না, এ অর্থ-হীন, উদ্দেশ্যবিহীন, কোলাহলের ভিতরে আমার স্থান কোথায়, আমি ত কেবল দ্রষ্টা,...কোথায় স্রষ্টা? তোমার ঠিকানা ত মিলিল না,...আছ কি? না-না-নাই, বিশ্ব-সৃষ্টিতে কোন শৃঙ্খলাই নাই, নাই। দেখিলাম ফলওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে, দেখিলাম "শিশি বোতল বিক্রীয়ে" হাঁকিতেছে। দেখিলাম শীর্ণ কোটরগতচক্ষু কেরাণীর দল মুখে বিড়ির ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে চলিয়াছে, মস্তকের কেশ সে এক অদ্ভুতভাবে ছাঁটা: সারি সারি কাল সাহেবের দল গুম্ফ-শ্মশ্রু বিবর্জ্জিত ফিরিঙ্গী বেশী, ফিরিঙ্গী বাঙলা মুখের বুলিতে আওড়াইয়া টাইপিষ্টের দল, যেন পৃথিবীর অভিনব জানোয়ার শ্রেণী, সাবান ঘষিয়া ঘষিয়া মুখে খড়ি উড়িতেছে: দেখিলাম মেছ-হাটার ছারপোকা-ওযালা উকিলের দল আঁচড়া-আঁচড়ী, কামড়া-কামড়ীর পয়সার জন্য কামড়া-কামড়ি করিতে ছুটিতেছে...দেখিলাম শুভ্র-বেশপরিহিত ঘড়ি-চেন ঝুলাইয়া গাঁটকাটা ও পকেটকাটার দল ভালমানুষী মুখে মাখাইয়া এধার ওধার করিয়া রাস্তায় বায়ুসেবন করিতেছে, তাহাদের সেই ভালমানুষীর রঙের আড়ালে যে শত শত তীক্ষ্ণধার ছুরীর খেলা চলিতেছে, তাহা সেই মুখখানা দেখি-লেই বুঝা যায়। দেখিলাম স্কুলের ছেলের দল চলিয়াছে, কেহ শীস দিতেছে, কেহ অশ্রাব্য ভাষায় পিতামাতার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। দেখিলাম গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, মোটার, চলিয়াছে, সবই জনপূর্ণ। এই জনাকীর্ণ সহরের পথে পথে ঘুরিতে লাগিলাম, মন

উদাস লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন শুধু চলিয়াছি—চলিয়াছি। দেখিলাম দুর্ব্বল ক্ষত জ্বালায় জর্জ্জরিত, কঙ্কাল অবশেষ গলিত কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্ন মলিন চীরখণ্ডজড়ান পা টানিতে টানিতে চলিয়াছে। যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে তাহারই পানে যাতনা-পীড়িত কাতর আঁখি তুলিয়া চাহিতেছে—যদি শেষ আশার ভরসা-রেখাও কেহ দান করে...সেই রক্তবর্ণ ঘোলাটে চোখের চাহনি... প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল। ভাবিলাম চারিদিকেই ত অভাব, কই, সবই যেন কি এক উদ্দেশ্যে চলিতেছে অথচ সে উদ্দেশ্য কেহ জানে না, জানিতে বুঝি চাহেও না। সমস্ত জগতটাই বুঝি কি এক জ্বালার তৃপ্তির জন্য ছুটিতেছে। হায় কোথায় তবে আনন্দ, কিসের খেলা, এই কি তার ছুটী? কার খেলা কার ছুটী...এম্নি করিয়া চলিয়াছি...কে যেন ডাকিল 'রাণী'...রাণী—রাণী...পরক্ষণেই বহুদিনের পুরাণ একখানা ছবি মনে হইল।

অকস্মাৎ মনে হইল রাণীদের বাড়ী যাই। সে যে আমার ছেলে-বেলায় খেলুড়ী। রাণী না হইলে আমার দিন কাটিত না, আমার খাওয়া হইত না, ঘুম হইত না, কত খেলাই সেই শৈশবের কোলে দুইজনে খেলিয়াছি। ছেলেবেলার সকল সুখদুঃখ যেন তাহারই সঙ্গে জড়াইয়া আছে, সে যে তখন ছিল আমার ছেলেবেলার রাণী। তার পর সে আজ কতকাল...তাহার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হইয়া-ছিল, তারপর সে হয় নাই...ভাবিলাম হয় ত চিনিবে নয় ত চিনিতে পারিবেই না। বালিকার সেই আকর্ণবিশ্রুত পদ্মপলাশলোচন চারু-ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখির পাতা, আর সেই দুষ্টামির হাসি...কোন্ অজ্ঞাত কারণে যে আমাকে সেখানে আমার মন টানিয়া লইয়া গেল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মনের মুখে ত আমার লাগাম ছিল না। ভাবিলাম কেনই সেখানে যাইতেছি। আবার কেমন মনে হইল, ছুটিয়া দ্রুত সেই পথে চলিলাম। ফটকে দ্বারবান কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রুক্ষকেশ ধূলি-ধূসরিত বেশ। ভাবিল এ আবার কে?

একটি ঘরে গিয়া বসিয়া রহিলাম। ছেলেবেলার ছবিগুলো নয়নের সম্মুখে একের পর এক আসিতে লাগিল। স্মৃতির যবনিকা একের পর এক সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহাতে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। শুধু ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছবি আর তার সঙ্গে আমার ভাঙ্গা হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন কি এক বেসুরা বাজিতেছিল.. সে সুর আজীবন মিলাইতে যে পারি নাই কেন, তারই আভাস যেন জানাইয়া দিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ রাণী আসিয়া আমায় বলিল—"কি সতীশ, কেমন আছিস, এত দিন পরে, ভাল আছিস, বিলেত থেকে ফিরে এসে কতদিন তোকে আসবার জন্যে বলেছিলুম, এদিকে ত একবার আসিস্‌ওনি।" আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল, তাহার স্বরে দীর্ঘ দিনের সেই সুপ্ত রাগিণী গাহিয়া উঠিল। আমি উত্তর দিতে পারিলাম না: মনে মনে কহিলাম...

"হ্যাঁ বাঁচিয়া ত আছি, তুমিও আছ"

আমি শুধু নিঃশব্দে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সে কত কথাই বলিতে লাগিল, কত কি জিজ্ঞাসা করিল...প্রথম প্রথম তাহার কথা কিছু যেন কানে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার ভাবও যেন বুঝিতেছিলাম, তারপর আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। শুধু শুনিতে লাগিলাম...আমি দেখিতেছিলাম সেই রাণী, পুষ্পকুঞ্জের শৈশবের খেলুড়ী, সেই ফুলের পাপড়ির গাঁথনি রাণী!...আজ সিঁতায় সিন্দুর পায়ে অলক্তক, করে শাঁখা,...চক্ষু ঝলসিয়া গেল···কত রমণীমূর্ত্তি হেরিয়াছি, কই এমনতর ত' দেখি নাই, কত কাম কামনার বিলাসিতার রূপের গরল আকণ্ঠ পান করিয়াছি, যৌবনের পাত্রে রূপ নিঙড়াইয়া পান করিয়াছি, কই এমন রূপ ত কখন দেখি নাই।... কোথায় সেই শৈশবের বালিকা, কোথায় এই তরুণী কিশোরীর রূপ-ভঙ্গিমা, আর কোথায় এই পীনোন্নত উরস, ব্রীড়াচঞ্চল যৌবন... ছয় ঋতুর সকল পুষ্পসম্ভার একাধারে কে যেন সাজাইয়া আপন মনে আপনি নিজের রূপে ভোর হইয়া হাসিতেছে। সন্ধ্যা-সূর্য্যের

রক্তিম আলোক বাতায়নের মধ্য দিয়া চলিয়া পড়িল। রাণীর মুখের উপর সেই সন্ধ্যারাগ ঝলকিয়া উঠিল, সর্ব্ব দেহের উপর দিয়া রূপের কি এক তরঙ্গ দুলিয়া গেল। ওঃ প্রাণের মধ্যে এক তুমুল ঝঞ্ঝা গর্জ্জিয়া উঠিল, সব যেন তোলপাড় হইয়া গেল!...রূপ! রূপ!... একি রূপ! চক্ষু রহ! রহ!...ওঃ একবার যদি...নাঃ...আরে পতঙ্গ দীপ দেখিলেই কি ঝাঁপ দিতে হইবে!...তারপর সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে ইচ্ছা হইল, পারিলাম না। কি যেন এক জ্বালা, চারিদিকে আগুনের মত আমায় ঘেরিল...ওঃ জ্বালা! জ্বালা! চক্ষে জল আসিল...আরে প্রাণহীন! পোড়া আঁখি যে তোর বহুদিন শুথাইয়া গেছে।...নিজেকে রোধ করিতে পারিলাম না, মনে হইল, ওঃ একটি বার, ওই নয়ন-মন শীতলকারী, প্রাণ-মন মনোহরা মন্মথের স্বপ্নশয্যায়... উঃ একবার...আমি অন্ধ, জগতে আর কিছু চক্ষে রহিল না...শুধু ওই রূপ ..সেই রূপে...হো! হো! পাগলের কি কোন জ্ঞান থাকে, মানুষ-ধর্ম্মও তার কোথায় মুছিয়া গেছে...নয়নে শুধু স্পর্শের লালসা...সে কথা বলিতে লাগিল... তাহার বিবাহের কথা, তাহার ছেলেবেলার ছবির কথা, তাহাদের বাগানে কেমন ভাল গোলাপজামের গাছের কথা...আমি শুধু শুনিয়া যাইতে লাগিলাম, শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল কোথায় যেন, জাগরণে না স্বপনে...এতদিন যে আগুন লইয়া খেলা করিতেছিলাম, তাহা ধবক্ ধবক্ জ্বলিয়া উঠিল...দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বক্ষে ধরিতে গেলাম...তাহার অঙ্গের গন্ধ যেন আমার প্রাণ মাতাইয়া তুলিল...সব স্পর্শের আগ্রহ যেন মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিল...কিন্তু সে সরিয়া গেল, তার আঁখির তারকায় কি বিদ্যুৎ, কি অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, মনে হইল একখানা বজ্রাগ্নির তলোয়ার-ধারে আমার হৃদয়টাকে টুকরা করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই শান্ত নির্ম্মল ছলছল অশ্রু-পীড়িত কাতর আঁখি বলিল—

"সতীশ তুই কি পাগল হয়েছিস্"

নতজানু হইয়া অবনত মস্তকে ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম। মনে করিয়ো না যে ভয়ে কাপুরুষতায় নতজানু হইয়াছিলাম। তাহা নয় .. অপরাধের জ্ঞানে পুরুষোচিত দর্পে। রাণী আমার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল,

"সতীশ তুই বুঝি কিছু খাস্নি, তোর মুখখানা অমন শুখ্নো কেন রে"? দেখিলাম সেই রাণীমূর্ত্তির গণ্ড বহিয়া জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে।...

আমার শুখ্নো মুখের কথা আর ত কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে নাই। আমার সুখ দুঃখের কথা ত কেহই ভাবে নাই। আমার জন্য ত কেহ চোখের জল ফেলে নাই! কার' হৃদয় পাই নাই, কার' হৃদয় ত স্পর্শ করি নাই। দূরে ঘুঘু ডাকিয়া উঠিল।...

তারপর বিশ্বের হাটে বাহির হইয়া পড়িলাম, দেখিলাম রাণী ভিতরে রাণী বাহিরে!!! কিন্তু তবু ও:...

ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত...সন্ধ্যার, অন্ধকারে জীবন যেন ভার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল, দূর হোক্ ছাই, বৈঠকেই যাই, আর কিছু না হউক, মদ ত সেখানে মিলিবে। সেখানে ফিরিলাম, সকলেই আনন্দ করিতেছে...কিন্তু কই! আমার যে কেবল জ্বালা, ওহো! হো! সফেণ পানপাত্রে কত কথা বলিতে লাগিল। খানসামা মদ লইয়া আসিল...আবার শুখ্না চোখে জল আসিল, জল নাই...চক্ষু হইতে আগুন বাহির হইয়া গেল।

"নেই মাঙ্তা যাও"

বলিয়া পানপাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলাম। পানপাত্র ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া গেল, বুদ্বুদমুখে তরল সুরা হর্ম্ম্যতলে গড়াইয়া গেল। চূর্ণ পানপাত্রের কণায় বিদ্যুতের মত যেন কার চাহনি ঝলক দিতেছিল।...

শ্রীঅপরাজিত।

# মায়াবতী পথে

[ ৫ ]

সন্ধ্যার কিছু পরে আমরা লমগড়-ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম। লমগড় আলমোরা হইতে দশ মাইল দূর এবং সমুদ্র-স্তর হইতে ৬৪৫০ ফিট্ উচ্চ। এখানকার ডাকবাংলাটি পূর্ব্বকার ডাকবাংলাগুলির হিসাবে ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সুগঠিত। কাঠগুদাম হইতে পিউড়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ডাকবাংলায় তিনটি করিয়া, এবং আলমোরার ডাকবাংলা দুটিতে চারখানি করিয়া শুইবার ঘর ছিল। কিন্তু লমগড় এবং তৎপরবর্ত্তী ডাকবাংলাগুলিতে দুইটি করিয়া শুইবার ঘর। আলমোরার পর এ পথে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়া এদিকের ডাকবাংলাগুলি বড় করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া পথশ্রান্তি দূর করিবার পূর্ব্বেই চিকিৎসকের কঠিন কর্ত্তব্য পুনরায় আমাদের স্কন্ধের উপর চাপিয়া বসিল! দেখিলাম চারি পাঁচ জন লোক বড় বড় পাত্রহস্তে আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল তাহারা পীড়িত; ঔষধ লইতে আসিয়াছে। এবার কেবল ডাণ্ডিওয়ালা বা কুলি নহে; রোগীগণের মধ্যে দুই তিন জন স্থানীয় অধিবাসীও ছিল। ইহাদের মধ্যে একজন ছিল স্বয়ং বাংলা-রক্ষকের নিকট আত্মীয়। রোগও এবার এক প্রকার নহে—নানা প্রকার। কাহারও মস্তিষ্কের পীড়া, কাহারও জ্বর, কাহারও বা পেটের পীড়া। চিকিৎসাশাস্ত্রের গভীর এবং অভ্রান্ত জ্ঞান আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়া এতগুলি লোকের বিশ্বাস দেখিয়া মনের মধ্যে সগর্ব্ব আনন্দ অনুভব করা গেল। কিন্তু এই সহজলব্ধ প্রসার কি প্রকারে বজায় থাকিবে সে

বিষয়েও উৎকণ্ঠা কম ছিল না। বিভিন্ন রোগগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইয়া তিনটি ঔষধ নিরূপণ করা গেল। যাহাদের জ্বর বা জ্বর-ভাব আছে তাহাদিগকে একোনাইট দিতে হইবে; যাহাদের মস্তকের পীড়া এবং মাথাধরা তাহাদিগকে বেলেডোনা দিতে হইবে; এবং যাহাদের পেটের অসুখ তাহাদিগকে পলসাটিলা দিতে হইবে।

ঔষধ অন্বেষণ করিতে গিয়া একমাত্র বেলেডোনা ভিন্ন অপর ঔষধগুলির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সমস্ত দিনের পরিশ্রান্তির পর সেই সামগ্রীস্তূপের মধ্য হইতে ঔষধ খুঁজিয়া বাহির করিবার মত কাহারও ধৈর্য্য ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না; অথচ রোগীগণের সনির্ব্বন্ধ কাতর অনুরোধ অতিক্রম করিবার কোন উপায় ছিল বলিয়া একেবারেই মনে হইল না। তখন নিরুপায় হইয়া বেলে ডোনা ঔষধের সর্ব্বরোগহারী অত্যাশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুণের কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেককেই এক ফোঁটা করিয়া প্রয়োগ করা গেল। হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্য-তত্ত্বে উদরাময়ে বেলেডোনার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। আমার বিনীত অনুরোধ বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথগণ এবিষয়ে একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি বেন। আমাদের মনে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহের কারণ ঘটিয়াছে। কারণ পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল এক এক ফোঁটা বেলেডোনা সেবন করিয়া দুইটি উদরাময়ের রোগী একেবারে রোগমুক্ত হইয়াছে। অবিশ্বাসী বলিবেন, হোমিওপ্যাথি যে বিশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নহে, এ ঘটনা তাঁহার অকাট্য প্রমাণ। বিশ্বাসী বলিবেন, "বিশ্বাস হোমিও-প্যাথি নহে। মাতৃক্রোড়ে অস্ফুটবাক্ অজ্ঞান শিশু, রোগ-শয্যায় জ্ঞানশূন্য প্রলাপযুক্ত রোগী, তৃণাহারী গো অশ্বাদি পশুগণ, সকলেই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে রোগ হইতে মুক্ত হইতেছে। বেলে-ডোনা খাইয়া উদরাময়ের রোগী আরোগ্য হইল, ইহা সত্য হইলেও ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইল না যে প্রদাহ-জনিত রোগে বেলেডোনা কার্য্যকারী নহে। অতএব বেলেডোনার যে সকল গুণ প্রতিষ্ঠিত

এবং নিরূপিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইতেও এ ঘটনার দ্বারা বেলেডোনা বঞ্চিত হইল না।"

বিশ্বাসী আমাকে ক্ষমা করিবেন; এই সম্পর্কে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল, অবিশ্বাসীর জ্ঞাতার্থে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। ভাগলপুরের কোন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার একটি রোগীকে পুরিয়া করিয়া ঔষধ দিয়াছিলেন। ঔষধ সেবন করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। কিছুদিন পরে উক্ত রোগী পুনরায় সেই রোগে আক্রান্ত হয়। রোগীর আত্মীয় পুনরায় ডাক্তারের নিকট হইতে ঔষধ লইতে আসিল। একবার উপকার হইয়াছিল বলিয়া ডাক্তার দ্বিতীয়বারও সেই একই ঔষধ দিলেন। এবার কিন্তু তেমন উপকার হইল না। রোগীর আত্মীয় আসিয়া কহিল, "গতবারে আপনি লাল ঔষধ দিয়াছিলেন তাহাতে রোগ সারিয়া যায়। এবারে সবুজ ঔষধ দিয়া কোন ফল হইল না। আপনি দয়া করিয়া লাল ঔষধই দিন।" ঔষধের বর্ণ ত খড়ির মত সাদা; ডাক্তার লাল ঔষধ ও সবুজ ঔষধের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারেন না। অনেক চিন্তার পর হঠাৎ মনে হইল যে মোড়কের কাগজের বর্ণের কথা বলিতেছে। প্রথমবার লাল কাগজের মোড়কে ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল, দ্বিতীয়বার সবুজ কাগজের মোড়কে দেওয়া হয়। তখন ডাক্তার সেই একই ঔষধ লাল কাগজের মোড়কে ভরিয়া দিলেন। এবার সেবন করা মাত্র রোগমুক্ত হইল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল তিনবারই মোড়কের কাগজশুদ্ধ বাটিয়া রোগী ঔষধ সেবন করিয়াছিল!

প্রত্যূষে চা-পান করিয়া আমরা ডাকবাংলার সম্মুখে আসিয়া বরফ দেখিতে বসিলাম। তখন নব-সূর্য্যের কিরণে তুষারগিরির কিরীটগুলি সবেমাত্র স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে—নিম্নের অংশ তখনও স্নিগ্ধ নীলাভ। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র তুষার উজ্জ্বল রৌপ্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অস্তকালের তুলনায় বরফের উপর উদয়-সূর্য্যের ক্রীড়া অপেক্ষাকৃত ক্ষণস্থায়ী এবং

বৈচিত্র্যহীন। নীলাভ বর্ণ হইতে উজ্জ্বল বর্ণে রূপান্তরিত হইতে প্রাতঃকালে যে সময় লাগে, সন্ধ্যাকালে উজ্জ্বল বর্ণ হইতে নীলাভ বর্ণে পরিণত হইতে তাহার চতুর্গুণ সময় লাগে *

বরফের উপর প্রভাত-সূর্য্যের এই বিচিত্র লীলা অধিকক্ষণ উপভোগ করা আমাদের ভাগ্যে ছিল না। এজেন্সীর চাপ্‌রাশি আসিয়া সংবাদ দিল যে কয়েকদিন পূর্ব্বে ডেপুটি কমিশনার সাহেব বহুসংখ্যক কুলি লইয়া গিয়াছেন বলিয়া পাটোয়ারী আমাদের জন্য কুলি সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। আবার এ সংবাদও পাওয়া গেল যে সম্ভবতঃ ডেপুটি কমিশনার সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সদলবলে লমগড় ডাকবাংলায় পৌঁছিবেন। লমগড় হইতে আমাদের নিষ্ক্রান্ত হইবার উপায় যদি না হইয়া উঠে, এবং ডেপুটি কমিশনার যদি সেদিন সন্ধ্যার সময়ে লমগড়ে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে রাত্রে আমাদের অবস্থা কি হইবে মনে মনে কল্পনা করিয়া আমরা বিচলিত হইয়া উঠিলাম—বরফ ও সূর্য্যকিরণের সমস্ত কাব্য এক মুহূর্ত্তেই অন্তর্হিত হইল। পাবলিকওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের নিয়মানুযায়ী ডাকবাংলায় সরকারী কর্ম্মচারীর অধিকার সকলের উপরে। সন্ধ্যার সময় ডেপুটি কমিশনার আসিয়া যদি ডাকবাংলা মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে তিন ঘণ্টার নোটিস্ দিয়া বসেন, তাহা হইলে তখন হয় বৃক্ষতল, নয় তরুতল এই দুইয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখা গেল ইহার মধ্যে একটিও তৃপ্তিপ্রদ বোধ হইবে না। উভয় পক্ষের ভদ্রতায় যদি মাঝামাঝি একটা রফা হয়—তাহাতেও আমাদের সুবিধা হইবে না, কারণ একটি ঘরে আমাদের সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব কোন প্রকারে সন্ধ্যার সময় পরবর্ত্তী ষ্টেজ মোরনাসায় পৌঁছাইতে পারিলেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। অন্ততঃ তিনচারখানি ডাণ্ডি ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিবার মত কুলি যাহাতে সংগ্রহ হয় সেজন্য এজেন্সীর চাপ্‌রাশিকে পাটোয়ারীর নিকট পুনরায় পাঠান হইল। বিশেষভাবে

অর্থের লোভ এবং অনর্থের ভয় দেখাইয়া চাপ্‌রাশিকে তৎপর করিবার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দণ্ড বা পুরস্কারের মাত্রা যতই অধিক করা যাক্ না কেন, লোক না থাকিলে লোক সংগ্রহ করা অসাধ্য ব্যাপার।

বেলা ২টার সময় যে কয়েকটি কুলি সংগ্রহ হইল তাহাতে দেখা গেল নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী, অর্থাৎ রাত্রের জন্য আহার এবং শয়নের ব্যবস্থা কোন প্রকারে যাইতে পারে। শাস্ত্রে আছে "সর্ব্ব-নাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" আমরা অর্দ্ধেকের অনেক অধিক ত্যাগ করিয়া মোরনালা যাত্রা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি-লাম। লমগড় হইতে মোরনালা সাড়ে আট মাইল পথ। এ পথটুকু হাঁটিয়া যাইতে সকলেই, এমন কি মহিলাগণও প্রস্তুত হইলেন। শুধু যে বাধ্য হইয়া, তাহা নহে; এ বিষয়ে অনেকের বিশেষ উৎসাহ এবং আনন্দ দেখা গেল। আমাদের দলের অন্যতম শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন সেন কয়েক দিন হইতে দুঃখ করিতেছিলেন যে ডাণ্ডিতে পথ অতিক্রম করিয়া, দুইবেলা যথারীতি আহারাদি করিতে করিতে এবং প্রতি রাত্রে ডাকবাংলার আরামপ্রদ কামরায় দীর্ঘ এবং গভীর নিদ্রা উপভোগ করিতে করিতে হিমালয় ভ্রমণ করা মঞ্জুরই নহে। দুই চার দিন যদি তরুতল-বাস এবং দুই তিন বেলা যদি উপবাস করিতে না হইল, এবং সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি সম্পূর্ণরূপে অবি-কৃত এবং অভগ্ন রহিল তবে হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া কি এমন পরমার্থ লাভ হইল। আজ একচটি হাঁটিয়া যাওয়া হইবে শুনিয়া শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বিশেষ উৎসাহভরে মশাল প্রস্তুত করাইতে বসিয়া গেলেন। মোরনালা পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথে অন্ধকার হইয়া গেলে এগুলি কাজে লাগিবে।

বেলা তিনটার সময়ে আমরা মোরনালা রওয়ানা হইলাম। আমাদের সঙ্গে মাত্র একখানি ডাণ্ডি রহিল—কাহারও বিশেষ প্রয়ো-জন বোধ হইলে ব্যবহার করা চলিবে। কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক পথ

অতিক্রম করার পরও কাহারও ডাণ্ডি ব্যবহার করিবার মত কোন লক্ষণ বা আগ্রহ প্রকাশ পাইল না। এমন কি আমরা যাঁহাদের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিত এবং চিন্তিত হইয়াছিলাম সেই মহিলাগণ প্রায় অর্দ্ধ মাইল আমাদের আগে আগেই চলিয়াছিলেন! সম্মুখে এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে, ইচ্ছা থাকিলেও ডাণ্ডিতে উঠিবার মত কাহারও নিলর্জ্জতা ছিল না। তাহা ছাড়া ক্লান্তি ও বিরক্তির প্রতিষেধকস্বরূপ প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য এবং স্নিগ্ধশীতল সমীরণ ত' ছিলই।

কিন্তু অর্দ্ধপথে পৌঁছিয়া যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহাতে আমাদের চক্ষুস্থির হইল। মোরনালার ডাকবাংলা আমাদের জন্য স্থির করিবার জন্য আমাদের রওয়ানা হইবার দুই তিন ঘণ্টা পূর্ব্বে মোরনালায় লোক পাঠান হইয়াছিল। সে আসিয়া জানাইল, ডাকবাংলা পাওয়া যাইবে না; একটি গোরা সাহেব আসিয়া বাংলা দখল করিয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সহচর আরও দুই-একজনের আসিবার কথা আছে। সে রাত্রে তাঁহারা সেখানেই থাকিবেন। বাংলারক্ষকের পরামর্শ—একদিন পরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

তখন বেলা প্রায় পাঁচটা—সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ঘোরতর সমস্যার মধ্যে পড়া গেল। যাহা অধিকার করিতে যাইতেছিলাম তাহা অধিকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহার অধিকার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি তাহা সম্ভবতঃ এতক্ষণে অধিকৃত হইয়া গেল। অগ্রসর হইলেও বিপদ, প্রত্যাবর্ত্তনেরও উপায় নাই। নূতন বন্দোবস্তের পূর্ব্বে পুরাতনকে যাহারা ইস্তফা দিয়া বসে, তাহাদের অবস্থা এমনই হয়! দুইটি প্রাচীন প্রবচন বহুদিন হইতে জানা আছে; রচনার মধ্যে, শিক্ষার ছলে এবং আরও নানাপ্রকারে বহুবার তাহা ব্যবহার এবং প্রয়োগ করা গিয়াছে। কিন্তু একদিন যে সে দুটি পাশাপাশি দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন নিদারুণ ভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহা জানিতাম না। এই কঠিন জীবন-

সংগ্রামের দিনে অবিবেচনার ফলে "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" বহুবার হইতে হইয়াছে, এবং এই সংসার-অরণ্যে মাঝে মাঝে এমন অজ্ঞাত এবং অনিরূপেয় স্থলে গিয়া পড়া গিয়াছে, যেখানে কিছুক্ষণের জন্য "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এতাবৎ একদিনও এমন গুরুতর ভাবে ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ হইয়া এমন দীর্ঘকাল ধরিয়া ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ভোগ করিতে হয় নাই!

ললিতবাবু বলিলেন, "বেশ হয়েছে, তবু একটা দিন একটু এ্যাড্‌ভেঞ্চর্ হ'ল। আগুন জ্বেলে ওভারকোট জড়িয়ে গাছতলায় রাত্রি কাটান যাবে; আর মেয়েদের জন্য গাছের ডাল ভেঙ্গে আর গায়ের কাপড় দিয়ে তাঁবু করে দেওয়া যাবে।"

ললিতবাবু বালক নন; বালকের প্রৌঢ় পিতা। তথাপি তাঁহার কথা অমৃতম্ বালভাষিতম্ মনে করিয়া তাহার মাধুর্য্য গ্রহণ করা গেল, তাহার যুক্তি গ্রহণ করা গেল না। সেই প্রখর শীতের রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের দৃষ্টি এবং লিপ্সার বিষয়ীভূত হইয়া সমস্ত রাত্রি গাছতলায় বসিয়া অ্যাড্‌ভেঞ্চর * করিবার ঔৎসুক্য কাহারও প্রকাশ পাইল না। যেখানে আমরা এই দুঃসংবাদ পাইলাম, দৈবযোগে ঠিক সেইখানেই একজন সাহেবের দুইখানি বাড়ী ছিল। কুলিরা বলিল, তন্মধ্যে একটি বাড়ী খালি আছে, রাত্রের মত সেখানি অধিকার করিতে না পারিলে বিপদ। গত্যন্তর নাই দেখিয়া তখন সেই চেষ্টাই করিতে হইল। শ্রীমান্ চিররঞ্জন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন এবং আমরা, সাহেব স্বীকৃত হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলে কি বলিয়া আপ্যায়িত করিব, মনে মনে তাহাই আওড়াইতে লাগিলাম। ভারতবর্ষের জল, হাওয়া এবং মাটি বহুসহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে যাহাদের রক্তমাংস এবং হাড়ের উপর ক্রিয়া করিয়াছে, দেহের সহিত তাহাদের মনও এমন এক বিচিত্র

---

* অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'অসমসাহসিক কর্ম্ম'।

ভঙ্গীতে বিকাশ লাভ করিয়াছে যাহার সহিত জগতের অপরাপর অঞ্চলের মনস্তত্ব কোনমতে খাপ খায় না। তাহারা যেমন শীঘ্র বিশ্বাস করে তেমনি সহজে আশ্বাস পায়! অধিকার করার চেয়ে আশ্রয় পাওয়া সহজ এবং সুবিধার, আশ্রয় পাইয়া পাইয়া সে ধারণা তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আবার অপরপক্ষে অধিকার করিয়া করিয়া তাহাদের মন এমনই কঠোর হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আশ্রয় দেওয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া, এবং আশ্রয় চাওয়াকে অপমানিত হওয়া মনে করে। তাই তাহাদের দেশে শীতের রাত্রে দরিদ্র পথিককে গৃহস্থের দরজার সম্মুখেও বরফ চাপা পড়িয়া মরিতে শুনা যায়।

প্রায় মিনিট দশেক অপেক্ষার পর দেখা গেল শ্রীমান চিররঞ্জন আসিতেছেন এবং তাঁহার সহিত একটি বৃদ্ধ শীর্ণদেহ সাহেব আসিতেছেন। মন্থর গতি দেখিয়াই গতিক মন্দ বুঝা গেল। তথাপি সাহেবের পায়ে বাতের বেদনাও থাকিতে পারে মনে করিয়া আশায় নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা গেল।

সাহেব আসিয়া আমাদিগকে অভিবাদন করিলেন এবং এত জিনিসপত্র এবং মহিলাদের লইয়া পূর্ব্বে মোরনালা ডাকবাংলা স্থির না করিয়া অর্দ্ধপথ চলিয়া আসিয়াছি এ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমাদিগকে স্নেহসূচক মৃদুমধুর ভর্ৎসনা করিলেন।

আমরা কহিলাম, সাহেব যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই সাহেবের নিকট আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। ডাকবাংলা পূর্ব্বাহ্নে অধিকৃত করিয়া রাখিলে এ সকল কথার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকিত না, অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের অবিমৃষ্যকারিতা এবং সাহেবের নিকট আশ্রয় চাওয়া এ দুইটা পরস্পর বিরোধী নহে বরং বিশেষভাবে দৃঢ়সম্বদ্ধ। সে হিসাবে সাহেব যে কথা বলিতেছেন তাহা সত্য হইলেও অবান্তর।

উত্তরে সাহেব বলিলেন যে, সে রাত্রে আমাদিগকে অতিথিরূপে লাভ করিতে পারিলে তিনি যৎপরোনাস্তি সুখীই হইতেন। কিন্তু আমাদেরই হিতার্থে সে সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তিনি সমীচীন মনে করিতেছেন, কারণ পথের মাঝখানে পরদিন কুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে; তখন আমরা এক বিপদ সামলাইতে গিয়া আর এক বিপদের মধ্যে পড়িব। তদপেক্ষা বরাবর মোরনালা চলিয়া যাওয়া ভাল। সেখানে ইয়োরোপীয়ান আছেন। মহিলাদের দেখিয়া তাঁহারা নিশ্চয়ই একটা ঘর ছাড়িয়া দিবেন। অতএব রাত্রি হইয়া আসিতেছে, সময় নষ্ট না করিয়া রওয়ানা হওয়াই কর্ত্তব্য।

স্নেহ জিনিসটা সংসারে দুর্লভ, এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিও সংসারে প্রচুর পাওয়া যায় না। সেই জন্য অকারণ অতিরিক্ত মাত্রায় কাহাকেও স্নেহশীল এবং হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিতে দেখিলে মনের মধ্যে খট্‌কা বাধে। এত গভীর ভাবে সাহেব আমাদের হিতাহিত বিবেচনা করিতেছেন দেখিয়া আমাদের মনের মধ্যে গভীর সন্দেহের উদয় হইল। প্রকাশ্যে কহা গেল যে, একবার অবিবেচনার কাজ করিয়াছি বলিয়াই সাহেব যেন মনে না করেন যে হিতাহিত জ্ঞান আমাদের একবারেই নাই। আজ রাত্রে গাছতলায় বাসের সম্ভাবনা এবং কাল প্রাতে যথেষ্ট কুলি না পাওয়ার আশঙ্কা এ দুইটার মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর আপত্তিজনক সেটা যে আমরা একেবারে বুঝি না তাহা নহে। আমাদের দ্রব্যাদি বরাবর মোরনালায় চলিয়া যাইতে পারে এবং প্রাতে আমরা পদব্রজে মোরনালায় চলিয়া যাইতে পারি। তাহা হইলে কুলির প্রয়োজনই হইবে না। আমাদের শয্যা প্রভৃতি বহন করিবার মত আমাদের যথেষ্ট ভৃত্য আছে। তাহা ছাড়া সাহেব যেন মনে না করেন কাল প্রাতে আমরা শুধু ধন্যবাদ দিয়া প্রস্থান করিব। এক রাত্রের জন্য যে ভাড়া সাহেব চাহিবেন তাহাও আমরা ধন্যবাদেরই সহিত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

কথামালায় ব্যাঘ্র ও মেষশাবকের গল্পে জানা গিয়াছিল যে দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে হিতৈষী ব্যক্তির ভাবনার অন্ত নাই। সাহেব বলিলেন, সেই রাত্রে তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর আগমনের সম্ভাবনা আছে। আমাদের আশ্রয় দেওয়ার পর তাহারা আসিয়া পড়িলে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। অতএব ইত্যাদি।

এ হিতৈষী ব্যক্তির নিকট হইতে মুক্তি পাওয়াই যে পরম লাভ, সে বিষয়ে আমাদের আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ভদ্র ভাষা ও ভদ্র ভঙ্গীর সাহায্যে যে মানুষ এমন—থাক্ আর সে সকল কথায় কাজ নাই। মনে মনে সাহেবকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মোরনালা অভিমুখে অগ্রসর হওয়া গেল। ডাকবাংলায় সাহেবের সহিত আলাপ্‌টা কিরূপ ভাবে জমিবে তাহা পরখ করিবার জন্য শ্রীমান চিররঞ্জন অশ্বপৃষ্ঠে অগ্রগামী হইলেন। এখানে যে ব্যবহারটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির হইতে পারে সে বিষয়ে এই মাত্র ভরসা ছিল যে শুনা গিয়াছিল এ ব্যক্তি সৈনিক কর্ম্মচারী। গোরার আচরণ আর যেরূপই হউক সাধারণতঃ সরল হইয়া থাকে। বুঝিবার এবং বুঝাইবার বিষয়ে সেখানে কোন প্রকার গোল হয় না—যাহা কিছু ঘটে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহরূপেই ঘটিতে দেখা যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা হইয়া গেল এবং সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেদিন শুক্ল সপ্তমী হইলেও সেই নিবিড় অরণ্য ভেদ করিয়া চন্দ্রকিরণ আসিবার পথ ছিল না; কাজে কাজেই কয়েকটি মশাল জ্বালিতে হইল। মশালের উজ্জ্বল আলোকে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার আরও দুর্ভেদ্য এবং ঘন হইয়া উঠিল এবং আলোকদীপ্ত বৃক্ষলতার উপর অতগুলি প্রাণীর দীর্ঘ এবং গতিশীল ছায়া পড়িয়া এক বিচিত্র এবং ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি করিল। মশাল জ্বালিয়া, দল বাঁধিয়া, পদদলিত বৃক্ষপত্রের এক বিচিত্র খস্‌খস্ শব্দ করিতে করিতে যাওয়ার মধ্যে বেশ

একটু অভিনবত্ব এবং আনন্দ পাওয়া যাইতেছিল। মশালের উজ্জ্বল আলোক এবং অরণ্যের নিবিড় অন্ধকার এই দুইটি বিরুদ্ধ রেখার সন্নিপাতে আমাদের দৃশ্যটি এমন একটি অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছিল যে মনে হইতেছিল না যে আমাদের অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য মোরনালা-ডাকবাংলার একখানি ঘর অধিকার করা।

কি কারণে বলা কঠিন, আমাদের মধ্যে কাহারও কাহারও শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি সহসা অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা পদে পদে নানাপ্রকার আকৃতি এবং শব্দ দেখিতে এবং শুনিতে লাগিলেন। ললিতবাবুর ঘ্রাণশক্তি এমনই প্রখর হইয়া উঠিল যে, বাঘের গন্ধ তাঁহার নাসিকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিল। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ তাঁহার আসামে বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতার অধিকারে এমন সকল লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের মনে হইতে লাগিল যে ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একটা বৃহৎ ব্যাঘ্র আমাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়ে! নিরস্ত্র হইয়া বাঘকে ভয় করে না এমন দুঃসাহসী আমাদের মধ্যে কেহও ছিলেন না; কিন্তু, কি কারণে তাহা বলিতে পারি না, ললিতবাবু ও সতীন্দ্রনাথ যতই বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে লাগিলেন, আমাদের মনে ততই ভয়ের অংশ কমিয়া কৌতুকের অংশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বন ছাড়িয়া আমরা মুক্ত স্থানে উপনীত হইলাম। এখান হইতে ডাকবাংলা পূরা এক মাইলও বোধ হয় নহে। কিন্তু পথের এই অংশটুকু এত ভয়ানক চড়াই যে লমগড় হইতে এ পর্য্যন্ত আসিতে আমরা যত না পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, এই পথটুকু অতিক্রম করিতে তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও কষ্ট হইল। রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমরা মোরনালার ডাকবাংলায় পৌঁছিলাম।

ডাকবাংলায় পৌঁছিয়া অবগত হইলাম যে সাহেব মাত্র একজন। আর যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহারা আসে নাই। কিন্তু তাহাতে

বিশেষ কিছু আসে যায় না—লোক যদি ভদ্র হয় তাহা হইলে পাঁচ-জনেও কোন ক্ষতি হয় না ; তাহা না হইলে একজনেই যথেষ্ট। সেই জন্য একজন শুনিয়াও আমাদের উৎকণ্ঠা বিশেষ কমে নাই। কিন্তু যাহা দেখিলাম তাহাতে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত আশঙ্কা এবং সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়া আমাদের মন শরৎকালের নির্ম্মল আকাশের মত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই চিররঞ্জনের সহিত সাহেব যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং শীতের রাত্রে মহিলা-গণ পদব্রজে আসিতেছেন শুনিয়া নিজ কক্ষে ফায়ারপ্রেসে আগুন জ্বালাইয়া ও চায়ের জন্য জল গরম করাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা পৌঁছিবামাত্র সাহেব কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের সহিত পরিচিত হইলেন, এবং কহিলেন যে আমাদের কোন প্রকারে অসুবিধা হইবে না। দুইটির মধ্যে একটি ঘরে মহিলারা থাকিবেন ; অপর ঘরটিতে আমরা পুরুষেরা থাকিব। এমন কি আমরা যদি প্রয়োজন মনে করি, তিনি তাঁহার ঘর একেবারেই ছাড়িয়া দিয়া বারাণ্ডায় থাকিতে পারেন।

সংসারে মনুষ্য-চরিত্রের বৈচিত্র্যের সীমা নাই! একজন যথেষ্ট স্থান থাকা সত্বেও বলে, বন্ধু আসিবে, স্থান হইবে না ; আর এক জন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অপরকে স্থান দিতে প্রস্তুত! এই গোরা সাহেবটির নাম লেফ্‌টেনাণ্ট্ জনষ্টন্ পীক্, ইনি আমাদের সহিত যে ব্যবহার করিলেন, একজন ভদ্রলোকের পক্ষে তাহা যে বিশেষ কিছু অদ্ভুত এবং অসাধারণ ব্যাপার তাহা বলি না। কিন্তু এই অভদ্রতা এবং স্বার্থপরতার দিনে সহজ ভদ্রতাই আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। নাকে ঘুসী, এবং গ্রীহায় লাথি না মারিলেই আজিকার দিনে ভদ্র। সে হিসাবে লেফ্‌টেনাণ্ট্ পীকের ভদ্রতাকে আদর্শ এবং অসাধারণ ভদ্রতা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে।

লেফ্‌টেনাণ্ট্ পীকের প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা তাহাতে সাধারণতঃ ইহাই দেখিয়াছি জানি-

য়াছি এবং শুনিয়াছি যে সিভিল কর্ম্মচারীর হিসাবে ইংরাজ সৈনিক কর্ম্মচারীকে অধিকমাত্রায় এবং অধিক সংখ্যায় ভদ্র এবং উদার হইতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না, এবং সে বিষয়ে আলোচনা করিবারও উপস্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজন নাই। কিন্তু কথাটা যে সত্য, তাহা আমি কেবলমাত্র লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ পীকের উদার ভদ্র এবং সরল ব্যবহারের উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি না। লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ পীক্‌ এ সত্যের প্রমাণ নহেন, উদাহরণ মাত্র।

লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ পীক্‌ আমাদের সহিত নানা বিষয়ে গল্প আরম্ভ করিলেন, তাহার মধ্যে যুদ্ধই প্রধান। ইঁহাকেও যুদ্ধে যাইবার জন্য আদেশ হইয়াছে। দুই তিন দিন পরে ইঁহাকেও আলমোরা হইতে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিতে হইবে। যুদ্ধ সম্বন্ধে ইঁহার মত—উপস্থিত সময়ে জার্ম্মাণী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু অবশেষে জার্ম্মাণীকে যে হারিতে হইবে তাহাও নিঃসন্দেহ। খবরের কাগজের সংবাদের উপর ইঁহার আস্থা দেখিলাম না।

নানা প্রকার গল্পে ও কথাবার্ত্তায় প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। আমাদের আহার্য্যও ততক্ষণে প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা নিজ নিজ স্থানে শয্যা গ্রহণ করিলাম।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

---

## কলঙ্কিণী

সখি, মিছে কর মোরে দোষী ;
রাধা রাধা বলে ডেকে ডেকে সদা পাগল করেছে বাঁশী ;
তোমাদেরি মত রহি গৃহমাঝে
ভুলিয়া থাকিতে শত শত কাজে

মনে করি সখি, তোমাদেরি মত জল লয়ে ফিরে আসি,
পারি না থাকিতে গৃহমাঝে আর সাধিয়া বাজিলে বাঁশী।

সখি, কি জানি মোহিনী আছে;
কুঞ্জ মাঝারে, ফুকারি ফুকারি যখন বাঁশরী বাজে,
কোন মতে আর পাসরিতে নারি
কুল লাজ মান সব ডোর ছিঁড়ি,
আকুলি ব্যাকুলি ছুটে প্রাণ ওলো কোথা সে কাননে আছে,
গৃহ ঘর দ্বার, সরূপ সংসার, মনে হয় সখি মিছে।

সখি তোমরাও যদি শোন,
পরাণ মাতান কি সে বাঁশী-ধ্বনি, হৃদি মন বিমোহন!
কেন কলঙ্কী হয়েছে লো রাধা
তোমরাও সখি বুঝিবে সে কথা
বুঝিবে রাধার নিশিদিন কেন প্রাণ এত উচাটন,
বহি কলঙ্ক-পসরা এমন সকলি ত্যজেছে কেন?

সখি, সকলি বুঝেছি মনে;
তবু হয়ে যাই পাগলিনী-প্রায় মধুর মুরলী তানে;
অনলেও ওলো মিছে অকারণ
কত পতঙ্গ সঁপে ত জীবন;
আমিও মজেছি, মরিব সজনি, বাঁশরীর ধ্বনি শুনে,
কি হবে সজনি কুল লাজ মানে, কি কাজ এ ছার প্রাণে!

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা।

# নারায়ণ

২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ] [ শ্রাবণ, ১৩২৩ সাল

## মহাধ্যান

বিরহের মহাধ্যানে আজি গো রয়েছে রাই,
বঁধুর কেমন রূপ কি বা গুণ মনে নাই!
কবে কে আছিল কাছে, কবে কে গিয়েছে দূরে,
কি গান গায়িত বাঁশী, কি নাম ফুটিত সুরে,
কি নাম আছিল কার, কে ভালবাসিত কারে,
ধরায় সকল স্মৃতি ডুবিয়াছে একেবারে!
কাহার তনয়া বালা, কেবা ছিল পতি তার,
কাহারে বাসিতে ভাল কলঙ্ক করিল সার,
দেখিল কাহার মুখে বিশ্বের মাধুরী যত,
কাহার চরণ দুটি সেবিল দাসীর মত,
কান্ত-ভাবে কার প্রেমে রস-সিন্ধু উথলিল,
মনে নাহি পড়ে কারে আপনারে সঁপি দিল।
বিশ্ব দৃশ্য গেল টুটি, লুকাইল চিত্ত মন,
স্বামিত্ব-আমিত্ব-লয়ে ধ্যান আজি সমাপন।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

# ধ্যানভঙ্গ

ধ্যান-ভঙ্গে দেখে রাই—বঁধু-রূপ বিশ্ব-রূপ,
ঝলমল করে তাহে নদ নদী সিন্ধু কূপ।
নহে নর, নহে নারী, নহে স্বামী, দাসী নয়,
নর নারী, স্বামী দাসী, সবার ভিতরে রয়।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আনন্দ-অমিয়া ঝরে,
সে যে রে পিরীতি সার কি চেতনে কি বা জড়ে।
অণু পরমাণু মাঝে আকর্ষণ রূপে রয়,
জীবের হৃদয় মাঝে সে যে রে কামনা হয়।
পিতা নন্দ, মা যশোদা, সখী বৃন্দা, সখা দাম,
নিজে রাই,—বহু ভাবে একি প্রেম পরিণাম।
যেই কৃষ্ণ সেই রাধা, রাধাকৃষ্ণ কোথা আর?
রন্ধ্র ওষ্ঠ সম্মিলনে বাজে বাঁশী বার বার।
প্রাণ দিয়ে শোনে রাই—বাজিছে পিরীতি-বাঁশী,
গোপ-গোপী, শশী রবি, যমুনা যেতেছে ভাসি।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

---

# বঙ্গদেশীয় মহাকাব্য

ইউরোপের বন্য আদিকবি সুপ্রসিদ্ধ হোমার প্রকৃতই বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যরচয়িতাগণের সমকক্ষ, কিন্তু তাঁহার কাব্য-রচনাপ্রণালী যে ভারতবর্ষীয় মহাকবিগণের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহা চিন্তাশীল কোন মহাপুরুষই স্বীকার করিবেন না। হোমারের ইলিয়ড্ ও অডিসিতে গুণের ভাগই অধিক, দোষের ভাগ যৎসামান্য; অন্ধ হোমার যে আমাদেরও আরাধ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুকরণে রোমের প্রসিদ্ধ কবি ভার্জিল ইলিয়াড্ রচনা করিয়া অসামান্য কবিযশঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতালির যশস্বী কবি দান্তে, ইংলণ্ডের মিল্টন, পর্ত্তুগালের ডিকামিয়ন্ প্রভৃতি ইউরোপের মহাকবিগণ হোমারের প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বন করিয়া সাহিত্য-শৃঙ্গের উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমাদের প্রণম্য, আমাদের মহাসমাদরের পাত্র। কিন্তু ইউরোপের মহাকাব্যরচনার প্রণালীতে এমন কি সৌন্দর্য্য আছে যে বঙ্গদেশীয় মহাকবিগণ বাল্মীকি প্রদর্শিত প্রণালীর অবহেলা করিয়া বিদেশী প্রণালী গ্রহণ করিবেন। আমাদের অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক না হইলেও, মাত্রায় বড়ই বেশী। আমরা অনুকরণ করিতে বড়ই ভালবাসি। বস্তুতঃ হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন প্রভৃতির যশঃসৌরভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বঙ্গদেশীয় মহাকবিগণ অনুকরণ-প্রবৃত্তিকে আদৌ সংযত করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাঁহারা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবী, মাঘ ও শ্রীহর্ষের প্রদর্শিত আমাদের নিজস্ব পথের উপেক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি লর্ড বাইরণ লিখিয়াছেন—

"Most Epic-poets plunge "in media's res,"
"Horace makes it the heroic turnpike road,

"And these your hero tells, whene'er you please,
"What went before by way of episode,
"While seated after dinner at his ease,
"Besides his mistress in some soft abode
"Palace or garden, paradise or cavern,
"Which serves the happy couple for a tavern,
"This is the usual method, but not mine,
"My way is to begin from the beginning ;
"The regularity of my design
"Forbids all wandering as the worst of sinning—
*Don Juan*, Canto I—6, 7.

লর্ড বাইরণ যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাল-মন্দর বিচার আলঙ্কারিকেরা করিবেন। সাহিত্যে সুরুচি ও কুরুচির বিচার সাধারণ লোকের উপর অর্পণ করিলে সমূহ বিভ্রাটের সম্ভাবনা। অনেক সময়েই কুরুচির অযথা আদর দেখিতে পাওয়া যায়। অশিক্ষিত সমাজে কুরুচির আদরও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু ইউরোপীয় অলঙ্কারে হোরেসের (Horace) প্রদর্শিত নিয়মাবলীতে নিমজ্জিত হইয়া যাঁহারা বিভোর হইয়া আছেন, তাহাদের সহিত বিচারযুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াও সুকঠিন। বর্ত্তমান বিষয়ে ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের বিচারের আসরে বাক্‌যুদ্ধে বা হস্তযুদ্ধে যোগদান করিবার অবকাশ হইবে না; তাহাদের সহিত আমাদের মতের বিভিন্নতার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু হোরেসের মতে অনুপ্রাণিত সাহিত্যিকদিগকে ভয় করি। বিচারের আসরে সত্যাসত্যের বড় একটা জ্ঞান থাকে না, এই ভয় আমাদের গুরুতর। বিশেষতঃ একদিকে ইউরোপীয় সুসভ্যসমাজের রীতি, অপরদিকে প্রতীচ্য ভূভাগের পুরাতন রীতি; সুতরাং বিতণ্ডাও ব্যক্তিগত হইবে না।

হোমারের ইলিয়ড্ ট্রয়যুদ্ধের আরম্ভ হইতে আরম্ভ হয় নাই। সর্গ ও প্রতিসর্গ, মুখ ও প্রতিমুখ, ভারতবর্ষীয় পুরাণাদির ও নাট-

কাব্যের মর্ম্ম; ইউরোপীয় মহাকাব্যের নহে। হোমার ট্রয়যুদ্ধের প্রায় মাঝামাঝির বর্ণনা "ইলিয়ডে" আরম্ভ করিলেন। গ্রীস দেশের পুরাতন ভাষা, হোমারের ভাষা, আমাদের প্রায়ই Greek (গ্রীক) অর্থাৎ দুর্বোধ্য। তজ্জন্য আমরা ইংরাজি অনুবাদ দিতে বাধ্য হইলাম।—

"Of Peleus' son, Achilles, sing, O, Muse,
"The vengeance, deep and deadly; whence to Greece
"Unnumbered ills arose; which many a sad
Of mighty warriors to the viewless shades
Untimely sent;" ইত্যাদি। *Derby*—Book I.

এই সূচনা পাঠ করিয়া মনে হইবে যে মহাকবি একিলেসের ক্রোধের ফলাফল সম্বন্ধে কাব্য লিখিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইলিয়ডে ট্রয়যুদ্ধের আংশিক বিবরণ লিখিত হইতেছে। মহারথীর ক্রোধ ঐ বহুবার্ষিকী যুদ্ধের একটি অঙ্গমাত্র। ইলিয়ডের অনেক অংশেই এই ভীষণ বিরাগের ফল বিবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ট্রয়যুদ্ধের ইতিহাস সমস্ত ইলিয়ডে ছড়ান আছে; কষ্টে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

মহাকবি হোমারের অডিসিও ইউরোপের একখানি প্রধান ও গণ্য কাব্য। ইহাতে ইথেকা দ্বীপের রাজা ইউলিসিসের (অডিসিয়সের) ট্রয়যুদ্ধের অবসানের পর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এই মহাকাব্যেও চতুর্বিংশতি সর্গের নবম সর্গ হইতে উপাখ্যান আরম্ভ এবং উপাখ্যানের অধিকাংশই নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ সর্গে অডিসিয়স স্বমুখে ফিনিসিয়ার রাজা আলকাইনসের মন্দিরে ভোজের পর ভোজের স্থানেই প্রকাশ করেন। ভোজ শেষ হইল, অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তাহার পর রাজা আলকাইনস জিজ্ঞাসা করিলেন—

"But come now, tell me this and tell me true—

Where thou hast wandered, to what lands hast gone,
And of the well-built cities fair to view,
And of the tribes of men whom thou hast known."
*Worsley's Odyssey*—Book VIII, 77.

তখন অডিসিয়স ট্রয় ত্যাগের পর হইতে তাঁহার সমুদ্রযাত্রার, দেশ দেশান্তরের, বিপত্তির বৃত্তান্ত উপাখ্যান ছলে বলিলেন। বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ হইয়া থাকিবে। সত্যসত্যই কবি বাইরণ বলিয়াছেন—

What went before by way of episode,
While seated after dinner at his ease.

ট্রয়ের দ্বাদশবার্ষিক যুদ্ধের অবসান হইলে ও রাজশ্রেষ্ঠ প্রায়ামের রাজ্য ও রাজধানী লয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সুযোগ্য বংশধর ইনিয়াস্ সদলবলে দেশ ত্যাগ করিয়া অর্ণবপোতে ইতালি প্রদেশে আগমনের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। সাত বৎসরকাল অর্ণবযানে বহুবিধ বিপত্তি ও ক্লেশ সহ্য করিয়া রাজপুত্র আফ্রিকার উত্তর প্রদেশে সাগরসনাথ টায়ারদেশীয়দিগের উপনিবেশ কার্থেজে আনীত হইলেন। কার্থেজের রাণী ডাইডো তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তথায় রাত্রিকালে যোগ্য ভোজ হইল। বিধিবৎ সুরাপানের ও বিবিধ কথাবার্ত্তার পর রাণী ইনিয়াসকে ট্রয়যুদ্ধের শেষ বৃত্তান্ত ও গ্রীকযবনদিগের শঠতা এবং তাঁহার সপ্তবার্ষিকী জল ও স্থলপথের ভ্রমণের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনিয়সও সেই সময়ে সুদীর্ঘ ইতিহাসের আবৃত্তি করিলেন। মহাকবি ভার্জ্জিলের ইনিয়ড্ মহাকাব্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গে এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন তাঁহার "পারাডাইস্ লষ্ট" মহাকাব্যের মধ্যস্থানে দেবদূতদিগের যুদ্ধের বর্ণনা করিয়াছেন এবং আধুনিক বঙ্গের মহাকবি মধুসূদনও ইউরোপীয়

মহাকবিদিগের অনুকরণে লঙ্কায় রামরাবণের যুদ্ধের মধ্যভাগ হইতে—বীরবাহুর পতনকাল হইতে—কাব্যারম্ভ করিয়া পরে পঞ্চবটী ও সীতা-হরণ বৃত্তান্ত ও মহাযুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাসের উপন্যাস অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন। কবিগুরু বাল্মীকির পদাম্বুজে প্রণাম করিয়াও তাঁহার প্রদর্শিত পন্থার—আর্শিয়াভূভাগের চিরপ্রচলিত পন্থার উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় রীতি অবলম্বন করিতে মধুসূদন কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ ইউরোপীয় মহাকাব্যসমূহই মধুসূদনের আদর্শ; হেক্টরবধ প্রণেতার হোমারই আদর্শ হওয়া সম্ভব। মধুসূদন গ্রীস দেশের ভাষার যবন (Ionian) শাখায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন কি না জানি না; মূল ইলিয়ড্ ও অডিসি পড়িয়াছিলেন কি না জানি না। ভার্জিল ও দান্তে লাটিন বা ইতালিয়ানে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না তাহাও আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু ইংরাজী কবি ড্রাইডেন ও পোপের অনুবাদ নিশ্চয়ই তিনি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন। মিল্টনে তিনি নিশ্চয়ই বেশ প্রবেশ করিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণে ব্যাসের মহাভারতে কালিদাসের কুমারসম্ভব বা রঘুবংশে তাহার প্রবেশ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে সকল অদ্বিতীয় মহাকাব্যের উপর তাহার বিশেষ আদর ছিল না। বেবিলনের মহাকাব্য ইস্তার ও ইজডুবের তাঁহার সময়ে ভূগর্ভ হইতে প্রকাশিত ও অনুবাদিত হয় নাই। পারস্য-মহাকবি ফারদৌসির শাহানামা তখনও ইংরাজী বা বাঙ্গলায় অনুবাদিত হয় নাই। মধুসূদন বাল্যাবধি ইংরাজী পাঠে নিবিষ্ট ছিলেন; তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় কেন, প্রাচ্য সকল বিষয়েই কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনাদর ছিল। সুতরাং ইউরোপীয় মহাকাব্যের রীতি অবলম্বন মধুসূদনের পক্ষে সময়োচিত জ্ঞান হইয়া থাকিবে।

বেবিলনের মহাকাব্যের ইস্তার ও ইজডুবেরের সম্যক গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহের বিষয়। সার্ অস্টিন হেনরি লেয়ার্ড (Sir Austin Henry Layard) ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে আসিরিয়ার গ্রন্থাগারের আবিষ্কার করেন। তাহার

প্রায় দশ বৎসর পরে সার্ হেনরী রলিনসন্ (Sir Henry Rawlinson) আরও অনেক গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। অনন্তর লফটাস (Loftus , জর্জ স্মিথ (George Smith) এবং রসম(Rassam) আরও গ্রন্থের আবিষ্কার করেন। স্মিথ সাহেবই বেবিলনের মহাকাব্যের আবিষ্কারক বলা যাইতে পারে। জোড়তাড় দিয়া হেমিল্টন সাহেব ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ইংরাজি পদ্যে "ইস্তার ও ইজডুবার" নাম দিয়া বেবিলনের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যতদূর সম্ভব হামিল্টন সাহেব (Leonidas Le Censi Hamilton M. A.) মূল গ্রন্থের শৃঙ্খলা ও ভাব রক্ষা করিয়াছেন। ইরেক্ আসিরিয়া দেশের একটি প্রধান নগর; ইজ্‌দুবার ইহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ইহার রাজা হইয়াছিলেন। ইস্তার তথাকার দেবী এবং তিনি ইজ্‌দুবারের পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষী হন। তাহাদের ইতিহাস, স্বর্গগমন ও মিলনই মহাকাব্যের বর্ণিত বিষয়।

ফারদৌসির সাহানামে পারস্যদেশের মহাকাব্য। এককালে এই গ্রন্থের অধ্যয়ন ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এক হিসাবে ইহা ঐতিহাসিক কাব্য—প্রায় ৩৬০০ বৎসরের পারস্যরাজন্যর ইতিহাস; কিন্তু কবিত্ব ও রচনামাধুর্য্যে ইহা যে একখানি প্রাচ্য মহাকাব্য তাহাতে দ্বিধাভাবের কারণ নাই। রোস্তমের ইতিহাস এই মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ। ইহাকে পারস্যদেশের পুরাণ বলা অসঙ্গত নহে। ইহার ঐতিহাসিক পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রাচ্য; ইউরোপের রীতির কোন চিহ্নই ইহাতে লক্ষিত হয় না। পারস্যদেশের প্রথম রাজা কাইউমার্স হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে সেকেন্দরের জয় ও মৃত্যু পর্য্যন্ত মহাকাব্যে বর্ণিত আছে।

ভারতবর্ষের মহাকাব্যসমূহের পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। রামায়ণ ও মহাভারত, মূলে না হউক, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের গ্রন্থে পাঠ করিয়াছেন। কালীদাসের মহাকাব্য "রঘুবংশে" রঘুবংশের রসাত্মক ইতিহাস দিলীপ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণিত।

"কুমারসম্ভব" গিরিরাজকন্যা অপর্ণার জন্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় কোন মহাকাব্যেই ইউরোপীয় রীতির আভাস নাই।

অনুকরণ সময়ে সময়ে মন্দ নহে, কিন্তু সুন্দর ও সহজ আদর্শ থাকিতে বিদেশী রীতির অনুকরণ কেন? খাপছাড়া বর্ণনা আমাদিগের তত ভাল লাগে না; কিন্তু যাহারা ইউরোপীয় ভাবে অনুপ্রাণিত তাহারা সেই ভাবেই মোহান্বিত হন।

মধুসূদনের মহাকাব্য "মেঘনাদবধ" আমাদের আদরের জিনিস। তিনি মহাকবি ছিলেন এবং তাহার লেখনী হইতে অমৃতময় কাব্যরস প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের জন্য বঙ্গভাষা গৌরবান্বিত; কিন্তু প্রাচ্য রীতির বিপর্য্যয় কেন? এপিকের (Epic) বিশেষ উপকারিতা কি? আমরা মহাকাব্যকে আবার Epic এবং Narrative এই দুইভাগে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন দেখি না। মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সর্গ প্রথম হইলে কি ক্ষতি হইত?

> "নমি আমি, কবি গুরু, তব পদাম্বুজে,
> বাল্মীকি, হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
> তব অনুগামী দাস"

—ইত্যাদি প্রথম সর্গে থাকিলেই শোভন হইত। অশোক কাননে একাকিনী শোকাকুলা রাঘববাঞ্ছার সরমাসুন্দরীর সহিত কথাবার্ত্তায় পুরাতন কথা বিবৃত হইল, কিন্তু রামরাবণের যুদ্ধের অনেকাংশই কবি পূর্ব্বেই পাঠকগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। মধুসূদন ইউরোপীয় কাব্যরসে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাহার পক্ষে হোমার, ভার্জিল প্রভৃতির অনুকরণ বিচিত্র নহে। যৌবনে তিনি ইংরাজীভাষায় ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কাব্য লিখিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের "রৈবতকে"ও মহাভারতের ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের ঐরূপে বর্ণনা। অর্জ্জুন গল্পচ্ছলে মহাভারতের আদিপর্ব্বের মূল উপাখ্যান ও শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভাগবতের নিজের উপাখ্যান পরস্পরকে জানাইলেন।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

## অনন্তরূপ

আশ্রম তব অন্তরে মম, অম্বরে তব ধ্যান,
জলদ গরিমা জটাজুট বজ্র তব বিষাণ।
নাচে আনন্দে সিন্ধুসলিল, সন্ধানে ফেরে মত্ত অনিল,
চন্দন মেখে সন্ধ্যা সুনীল বন্দনা গাহে গান।
রবিকর তব তেজঃপুঞ্জ ঘোর অটবী আরামকুঞ্জ,
বিশ্বহৃদয় প্রীতিপুঞ্জ অঞ্জলি করে দান।
সপ্তসাগরে তপ্তহৃদয়, কখনো ক্ষুব্ধ কখনো সদয়,
আধেক সৃষ্টি আধেক প্রলয়—বিশ্ব করায় স্নান।
সংহার তব সন্ধ্যা আরতি, মৃত্যু তোমার রথের সারথী,
দুঃখ তোমার ছদ্ম মূরতি, ক্রন্দন শুধু ভান।
চন্দ্র তোমার চারু ললাটিকা, লক্ষ তারকা কণ্ঠমালিকা,
বিশ্ব তোমার পণ্যবীথিকা, পুণ্য তোমার প্রাণ।
সপ্তস্বরা এ সংসার তব, আশা ও নিরাশা সুর নব নব,
ব্যাকুল বাসনা বাঁশরীর রব, মঙ্গল তব জ্ঞান।
জীবন তোমার নিমেষ দৃষ্টি, জন্মমরণ আঁখির সৃষ্টি,
অশ্রু তোমার করুণাবৃষ্টি প্রলয় প্রেমের বান।

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

# চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

[ ১ ]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত এক-দিন তাঁহার পটলডাঙ্গার বাসায় সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে রাজেন্দ্রলালের শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিতে আরম্ভ করি-লেন—

"১৮৭৭ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে আমি এম, এ, পাশ করি। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন তখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহিত তাঁহার খুব সদ্ভাব ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় একদিন প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার নিকট আমার উল্লেখ করেন। রাজেন্দ্রলাল আমাকে দেখিতে চান। পণ্ডিতমহাশয় এক-দিবস আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, রাজেন্দ্রলাল তোমাকে দেখিতে চাহেন, একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ কর।'

রাজেন্দ্রলাল তখন মাণিকতলায় ৮নং বাটীতে থাকিতেন। এই বাটীর এক পার্শ্বে তখন ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশন্ ছিল, আর এক পার্শ্বে তিনি পুত্রগণকে লইয়া থাকিতেন। আমার বাসা সে সময় আম্‌হার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটে ছিল। একদিন রাজেন্দ্রলালের সহিত দেখা করিতে গেলাম। উমেশচন্দ্র বটব্যালের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় উমেশচন্দ্র রাজেন্দ্রলালের নিকট যাতায়াত করি-তেন। মিত্রমহাশয় আমাকে ও উমেশকে একটা কাজের ভার দিলেন।

"এসিয়াটিক্ সোসাইটী হইতে রাজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় উপনিষদ্ বাহির হইবার কথা চলিতেছিল। তিনি উহার কিয়দংশের ইংরাজী অনুবাদের ভার আমাদের উপর দিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'উপনিষদের কোন্ অংশের অনুবাদ করিতে হইবে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'Make your own choice.' ইহার কিছুদিন পরে আমি ও বটব্যাল অনুবাদ লইয়া মিত্রমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম। উপনিষদের যে অংশ আমি অনুবাদ করিয়াছিলাম সে অংশের প্রত্যেক শব্দের টীকা ফুট্‌নোটে দিয়াছিলাম, এবং কে কোন্ অর্থে উহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলি নাই। রাজেন্দ্রলাল আমার অনুবাদ পড়িয়া বলিলেন—'তোমার কিছুই হয় নাই। কি প্রকারে অনুবাদ করিতে হয় তাহা তুমি জান না। তোমার দ্বারা এ কাজ হইবে না। দেখ ত উমেশ কেমন সুন্দর অনুবাদ করিয়াছে।'

"বটব্যালের লেখা তিনি খুব পছন্দ করিলেন এবং উহার প্রশংসাও করিলেন। ইহার পর কিছুকাল রাজেন্দ্রলালের সহিত আর সাক্ষাৎ করি নাই। একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দিয়া তিনি আবার আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। উমেশচন্দ্র Statutory Civilian হইয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যান। রাজেন্দ্রলালের কাজ করিবার জন্য একজন লোকের আবশ্যক হয়, তাই আমাকে আবার ডাকিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন—

'I have been rather too hard upon you. তুমি যে সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছ তাহা আমার স্মরণ ছিল না। উপনিষদের অনুবাদ করা অতি দুরূহ, তাহার ভার তোমার উপর দিয়া বড় অন্যায় করিয়াছি। যাহাহউক, এইবার তোমাকে একটা সহজ কাজের ভার দিতেছি।'

"নেপাল হইতে যে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথিগুলি সোসাইটীতে আসিয়া স্তূপাকার হইয়াছিল মিত্র মহাশয় তাহার একটা 'ক্যাটালগ' প্রস্তুত

করিতেছিলেন। তাঁহার নিযুক্ত পণ্ডিতেরা পুঁথিগুলির summary করিয়া দিত, সেই সকল summary ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ভার পড়িল আমার উপর। আমি কিছুদিন কাজ করিয়া লক্ষ্ণৌ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া যাই। আমার শরীর তখন তেমন ভাল ছিল না, তাই যাইবার সময় রাজেন্দ্রলাল আমাকে বলিয়াছিলেন, 'Try to increase the span of your existence.' লক্ষ্ণৌ কলেজে আমি বেশী দিন থাকি নাই। ১৮৭৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত তথায় অধ্যাপনা করি, পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। লক্ষ্ণৌসহরে থাকিবার সময় আমার সহিত রাজেন্দ্রলালের পত্রবিনিময় চলিত। আমাকে তিনি কত স্নেহ করিতেন তাহা তাঁহার পত্রে বুঝিতে পারিতাম। প্রায়ই তিনি আমাকে কলিকাতায় আসিতে উপদেশ দিতেন। আমার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি কত উৎসুক ছিলেন! তাঁহার ক্যাটালগের প্রুফ্‌গুলি আমার কাছে যাইত, আমি উহা সংশোধন করিয়া ফেরৎ পাঠাইতাম। রাজেন্দ্রলাল আমাকে যে সকল পত্র লিখেন তাহা আর এখন নাই, অধিকাংশই হারাইয়া গিয়াছে। নৈহাটীর বাটীতে সন্ধান করিলে এখনও বোধ হয় দুই-একখানি মিলিতে পারে।

"কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজেন্দ্রলালের কাজ করিতে আরম্ভ করি। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Nepalese Budhist Literature নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উহার ভূমিকায় তিনি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিবেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। একদিন তিনি ইচ্ছা করিয়া ভূমিকার ঠিক ঐ অংশেরই প্রুফ্ আমাকে দেখিতে দিলেন। সেই জায়গাটা তোমাকে দেখাইতেছি।" শাস্ত্রী মহাশয়ের পণ্ডিত শেল্‌ফ হইতে একখণ্ড Nepalese Budhist Literature নামাইয়া আমার হাতে দিলেন।

শাস্ত্রী মহাশয় আমার হাত হইতে বহিখানা লইয়া উহার গোড়ার একটা পাতা খুলিয়া আমাকে পড়িতে দিলেন। উহাতে লেখা আছে,—

"During a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M. A., offered me his co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. * * * * I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task; and he did his work to my entire satisfaction."

শাস্ত্রী মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এরূপ প্রশংসা কখনও আশা করি নাই। বাস্তবিক, সেদিন আমার যে আনন্দ হইয়াছিল আজ চৌত্রিশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি আমার মনে আসিতেছে। লক্ষ্ণৌয়ে থাকিবার সময় আমি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। এই সময় রাজেন্দ্রলাল এক পত্রে আমাকে লিখেন,— 'I wish you every success in your new venture'— কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরও প্রগাঢ় হইয়াছিল। মিত্র মহাশয়ের ক্যাটালগ তখন বাহির হইয়া গিয়াছে। একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'হরপ্রসাদ, আমার পুস্তকের জন্য তুমি বিস্তর খাটিয়াছ, তোমাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে চাই।' এই বলিয়া আমার হাতে একখানা ১৪৫৲ টাকার চেক দিলেন; এই অযাচিত দান আমি মাথা পাতিয়া লইয়াছিলাম।

"তাঁহার দৈনিক জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা তোমাকে বলিতেছি। তিনি খুব ভোরে উঠিতেন। তাঁহার একখানা গাড়ী ছিল, তাহাতে

করিয়া হেদোর ধারে আসিতেন। সেখানে কৃষ্ণদাস পাল, মহেশ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকে আসিয়া জুটিতেন। তখন একটি বেশ দল হইত। নানারূপ গল্প করিতে করিতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ধরিয়া শ্যামবাজারের দিকে হাঁটিয়া যাইতেন, গাড়ী পিছন পিছন চলিত। বেড়ান সারা হইলে রাজেন্দ্রলাল গাড়ীতে উঠিয়া বাসায় ফিরিতেন। তাঁহার বাটীর উপরতলায় একটা বড় হল্ ছিল, তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বের একটি ঘরে তিনি অধ্যয়ন করিতেন। ঠিক যখন আটটা বাজিত, তখন আমরা আসিয়া জুটিতাম। আমি সবদিন যাইতাম না, যেদিন প্রুফ্ দেখার দরকার হইত সেই দিন যাইতাম। প্রুফ্ দেখা শেষ হইলে বেলা সাড়ে নয়টায় রাজেন্দ্রলাল স্নানে যাইতেন। স্নান আহার সারিয়া ১২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। তাহার পর পড়িতে বসিতেন। নূতন পুস্তক তিনি এক অভিনব প্রণালীতে পড়িতেন। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা পড়িলেন, যদি কিছু নোট করিবার থাকিত নোট করিলেন, নীল পেন্সিল দিয়া আবশ্যক অংশ চিহ্নিত করিলেন, তাহার পর পরবর্ত্তী চারি পৃষ্ঠা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন পঞ্চম পৃষ্ঠা পড়া হইলে আবার দশম পৃষ্ঠা পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এইরূপ চারি পাতা অন্তর একটি পাতা পড়া তাঁহার অভ্যাস ছিল। একদিন কৌতূহলী হইয়া আমি ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাজেন্দ্রলাল উত্তরে বলিলেন—গ্রন্থের প্রথম পাতাতেই যদি কোনও মৌলিকতার আভাস পাই, তাহার পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা পাঠ করি, তাহা না পাইলে চারিটি পাতা বাদ দিয়া পঞ্চম পাতায় কি আছে দেখি; তাহাতেও যদি লেখকের কোন বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় না পাই বহিখানি বন্ধ করি।'

"এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত পাতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও উহার ইংরাজী অনুবাদ বাহির হয়। ইহার কিছুদিন পরেই (১৮৮২ সালে) কাওয়েল এবং গাফ্ মাধবাচার্য্যের 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের' ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। একদিন রাজেন্দ্র-